সবুজ পত্র

NABINCHANDRA COLLEGE MAGAZINE
2009-2010

নবীনচন্দ্র কলেজ পত্রিকা
২০০৯-২০১০

নবীনচন্দ্র কলেজের এন.সি.সি. এবং এন.এস.এস.–এর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রণপ্রথা বিরোধী পথ–যাত্রায় এন.সি.সি.–র ক্যাডেটরা (১৪ আগস্ট ২০০৯)।

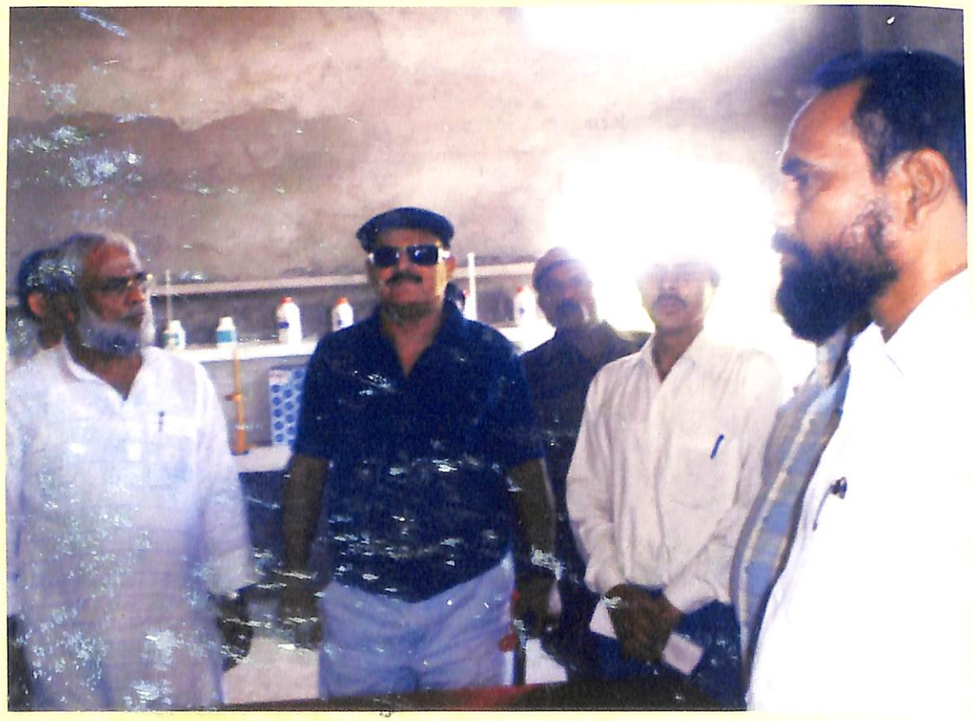

প্রাক্তন গভার্নিং বডির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গৌতম রায় এবং বদরপুরের এম.এল.এ. মোঃ আনোয়ারুল হক মহাশয় কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি প্রদর্শনরত।

সবুজ পত্র

NABIN CHANDRA COLLEGE LIBRARY
BADARPUR KARIMGANJ
57

NABINCHANDRA COLLEGE
BADARPUR :: KARIMGANJ
Estd.1969

'সবুজ পত্র'–এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক
শ্রী বিষ্ণু চন্দ্র দে
বিভাগীয় প্রধান, প্রবক্তা, বাংলা বিভাগ
নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুর

'সবুজ পত্র'–এর সম্পাদক মণ্ডলী
ড০ পাওলস ভি. ডি.
প্রবক্তা, ইংরেজী বিভাগ
নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুর

'সবুজ পত্র'–এর সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রী শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী
বরিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক
নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুর

'সবুজ পত্র'–এর সম্পাদক মণ্ডলী
ড০ বর্ণশ্রী বকসি
প্রবক্তা, বাংলা বিভাগ
নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুর

Prof. Tapodhir Bhattacharjee
M.A. (Triple), Ph.D.
Vice-Chancellor

ASSAM UNIVERSITY
(A Central University)
Silchar 788 011, Assam (India)

MESSAGE

I am glad to know that N.C.College, Badarpur is going to publish its literary journal. An educational institute is never complete without the literary and cultural expressions of its students. Hence, it is heartening that in spite of heavy odds, the teacher and students of the college are busy in curving out refreshing domain for themselves through their college journal. I hope that journal would be a true platform for voicing forth new ideas and thoughts of our young generation which would be able to rekindle faith and imagination of the entire students community for the society at large.

I wish this publication a grand success.

Tapodhir Bhattacharjee

(Prof. Tapodhir Bhattacharjee)

☎ 91-3842-270801, 270273 (Office) 270202, 270939 (Residence) Fax 270802
email : auves@sancharnet.in

Debasish Bhattacharjee, M.A., Ph.D.
Prof. Deptt. of Political Science
Assam University, Silchar - 788 011
Phone : 03842-270833

President, Governing Body
Nabin Chandra College, Badarpur
Dist - Karimganj, Assam

MESSAGE

I am happy to be informed that 'SABUJ PATRA', the Mouthpiece of Nabin Chandra College, Badarpur is going to be published in its usual way this year. Magazines help to spread ideas and sharpen the sprit of intellectual enquiry. Ideas move people, particularly the younger section who conceive things better and early. I am confident that 'SABUJ PATRA' will provide an excellent outlet for the expression of ideas and intellectual talent of the students of the College.

I wish 'SABUJ PATRA' great success and send my best wishes to all its editors, contributors and readers.

Debasish Bhattacharjee

(Debasish Bhattacharjee)

Residence : 'DEOPARA' Panchayat Road, Silchar - 788 005, Phone : 03842-224381

NABIN CHANDRA COLLEGE

সূচি

সম্পাদকীয়			১
অধ্যক্ষের কলম	অরুণকুমার সেন		২
Staff of Nabin Chandra College, Badarpur Academic Session 2009-10			৩
ছাত্র রাজনীতি ঃ স্বরূপ ও শুদ্ধিকরণ	অরুণ কুমার সেন		৫
ডায়াসপোরিক ইতিকথা ও বাঙালি ডায়াসপোরিক লেখক বৃত্তান্ত	বিষ্ণু চন্দ্র দে		৮
বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ সিকেন্স এবং ক্লাস্টার	ড. পাওলস ভি ডি		১৩
তথ্যের অধিকার ঃ একটি সাংবিধানিক স্বাধীনতা	শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী		১৬
ক্ষুধা এবং ভারতবর্ষ	শ্রী সৌমিত্র চৌধুরী		২১
মিথ ও পুরাণ	সুস্মিতা নাথ		২২
নারী নির্যাতনের জন্য নারীরাই দায়ী	হাফিজা খাতুন		২৪
মানবিকতা	খাদিজা সুলতানা		২৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্প	পর্ণা পুরকায়স্থ		২৫
মিথ্যা কথা না বলে যাই কোথায়	সবিতা রায়		২৬
পর্যটন	শ্রী স্বরাজ চৌধুরী		২৬
লিভটুগেদার বনাম বৈবাহিক সম্পর্ক	মস্তাক আহমদ		২৭
মানবিকতা	মৌমিতা ভট্টাচার্য		২৭
বর্তমান সমাজ ও ছাত্র রাজনীতি	হাফিজ মোহম্মদ ইমদ হোসেন		২৮
আমাদের সমাজ	পাকিজা বেগম		২৯
ভালোবাসার টানে	রূপালী মজুমদার		৩০
মন যে আমার মাকে ডাকে	জয়দেব দাস		৩০
হে দয়াময়	জুলফিকার জালালি		৩১
প্রথম দেখা	রুমাশ্রী দাস		৩১
যদি হারিয়ে যাও	রৌসনারা বেগম তালুকদার		৩২
এর নাম জীবন	কমরুল জালাম		৩২
ছয় ঋতু	রুমি বড়াল		৩৩
মাতৃ আক্ষেপ	প্রিয়াঙ্কা ধর		৩৩
হারানো হৃদয়	অনন্যা গুপ্ত		৩৪
কলমের কালি	আলপনা দাস		৩৪
আমার যাত্রা পথ	রোস্তমা বেগম		৩৫
ফুলের সেরা গোলাপ	সুজাতা দাস		৩৫
হতে পারি...	হায়দর আলী		৩৬
ছন্দ নেই	অশ্রোতা চৌধুরী		৩৬
কোথায় স্বপ্নপুরী	সুতপা ভট্টাচার্য		৩৭

●	পূজোর দিনে	ঃ	রূপা সেন	ঃ ৩৭
●	ভারতের ক্রিকেট	ঃ	মিঠু সাহা	ঃ ৩৭
●	ফ্রি	ঃ	মণ্টি তালুকদার	ঃ ৩৮
●	আত্ম-বিরহ	ঃ	পিয়াল দে	ঃ ৩৮
●	উমা	ঃ	দেবশ্রী গোস্বামী	ঃ ৩৯
●	Human rights in pre & post independent India	ঃ	Debajyoti Das Gupta	ঃ ৪১
●	Environmental protection is a worship for a muslim	ঃ	Dr. Fazlur Rahman Laskar	ঃ ৪৫
●	The position of women in islam	ঃ	Hedayatullah Cchoudhury	ঃ ৪৭
●	Chinua achebe and his "things fall apart"	ঃ	Shakil Ahmed	ঃ ৪৮
●	Allegorical interpretation of prospero-miranda, Ariel-caliban in 'the tempest'	ঃ	Dr. Shibtapan Basu	ঃ ৫১
●	Ngos and economic development the connecting link	ঃ	Ananta Pegu	ঃ ৫৪
●	Role of entrepreneurial development programme In entrepreneurship development and economic development in north eastern region	ঃ	Md. Iqbal Uddin	ঃ ৫৬
●	Panchayati Raj in India	ঃ	Md. Ershad Uddin	ঃ ৫৯
●	History of corporate governance relating To Indian commercialisation	ঃ	Md. Tahir Ahmed	ঃ ৬৩
●	Poverty scenario in India	ঃ	Nahed Vawsar Choudhury	ঃ ৬৪
●	Bond of friendship	ঃ	Banti Roy	ঃ ৬৫
●	The internal quality assurance cell (Iqac) of nabinchandra college	ঃ	Rajat Bhattacharya	ঃ ৬৬
●	The large hadron collider	ঃ	Nilabjo Kanti Paul	ঃ ৬৭

প্রচ্ছদ ঃ কুমার বিষ্ণু দে

অলংকরণ ঃ গোষ্ঠ পাখিরা, সুজিত দাস

মুদ্রণ ঃ অভিষেক প্রিন্টার্স, অম্বিকাপট্টি, শিলচর

Correspondence

Principal
Nabin Chandra College
P.O. Badarpur, Dist - Karimganj
Phone No. - 03845-268153
E-mail : n_ccollege@rediffmail.com
wedsite : www.nccollegebdr.org

সম্পাদকীয়

বলার নয়, তবুও বলা

"আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ন্তর নেই।" অতএব দাঁড়াল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকল শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতাকে সমানভাবে সাহিত্যচর্চা করতে হবে। প্রমথ চৌধুরীর মতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষ গড়ার কারখানা হলেও আসল মানুষ তৈরি হয় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। "যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাত জ্ঞানেও বড়ো নয়।" তাই মন ও মানসিকতাকে সমৃদ্ধ করতে হলে সাহিত্যচর্চা করতেই হবে। হয়তো এই চিন্তা মাথায় রেখে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই একটি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করে থাকেন। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের মস্তিষ্কগত বলে যোগ্য মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনেকটা ঘাটতি থেকে যায়। তাই হৃদয়ের উৎস থেকে উৎসারিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ সাহিত্যের স্ফূরণ ঘটাতেই প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহৎ প্রয়াস 'সবুজ পত্র' নামক বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকাটি।

আমরা চেষ্টা করেছি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সকল লেখাকেই হুবহু প্রকাশ করতে। তাদের উৎসাহেই একদিন 'সবুজ পত্র' সাহিত্য জগতে এক যুগান্তকারী নাম কেড়ে আনবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। নবীনচন্দ্র কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং শিক্ষা-কর্মীবৃন্দ অনেকের মূল্যবান লেখাই পত্রিকাটিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ দিতে লেখাগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকা লেখা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সময়ের অভাবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁরা লেখা দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা ও উৎসাহের বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ঘটেনি। 'সবুজ পত্র'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সহযোগিতা ব্যতীত পত্রিকাটি সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে উঠত না। তবুও বলা চলে, পত্রিকাটি আন্তরিকতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন ত্রুটির জন্য 'সবুজ পত্র'-এর দায়িত্বভার গ্রহণকারী হিসেবে সকল দোষ আমার নিজের ওপর বর্তায়।

শ্রী বিষ্ণু চন্দ্র দে
বাংলা বিভাগীয় প্রধান
সম্পাদক, 'সবুজ পত্র'
নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুর

অধ্যক্ষের কলম

সাল ১৯৬৯ থেকে সাল ২০০৯— চার দশক। নবীনচন্দ্র কলেজ নামক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সগৌরবে চার দশকের যাত্রাপথ অতিক্রম করা নিঃসন্দেহে এক শ্লাঘনীয় অধ্যায়। নিছক যাত্রাপথ অতিক্রম করাই নয়, এ হল ক্রমোন্নতির পথে অগ্রায়মান হওয়া। নবীনচন্দ্র কলেজ আজ এক পূর্ণাঙ্গ কলেজ। এই কলেজে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠক্রম ছাড়াও রয়েছে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা। রয়েছে কম্প্যুটার শিক্ষণের সুব্যবস্থা এবং উন্নত আধুনিক মানের গ্রন্থাগার। মানে-পরিমানে ক্রম বিবর্ধিত এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমান ছাত্রসংখ্যা দেড় হাজারের কাছাকাছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ যে গৌরবময় স্থিতি লাভ করেছে তার কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্যই এককভাবে কেউ নন। কলেজটির প্রতিষ্ঠালগ্নে বদরপুর তথা বহির্বদরপুরের অনেক সহৃদয় ব্যক্তির নিরলস প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়। তাঁদের কায়িক ও আর্থিক দান কলেজটির উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রেখেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ব্যক্তি তথা কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস প্রচেষ্টা এবং ঐকান্তিকতার নিরন্তরতা অব্যাহত থাকার ফলেই কলেজটির ক্রমোন্নতির পথে কোনও স্থবিরতা প্রকটমান হয়নি। বর্তমানে যাঁরা কলেজটির সাথে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাঁদের কর্মতৎপরতা ও কর্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎকে অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল করে তুলবে—— এরূপ আশা মোটেই অবান্তর নয়।

কলেজের সামগ্রিক উৎকর্ষের বিভিন্ন সূচকের মধ্যে কলেজ পত্রিকাও যে অন্তর্ভুক্ত, তা অনস্বীকার্য। কলেজ শিক্ষার্থীর অন্তর্লীন সৃজনশক্তির অভিব্যক্তি ও বিকাশের মাধ্যম হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে কলেজ পত্রিকা। আজ যারা ছাত্র, তারাই আগামীদিনের কবি সাহিত্যিক। এই সম্ভাব্য কবি সাহিত্যিকের রচনার হাতেখড়ি কলেজ পত্রিকা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি বৃক্ষবীজের অঙ্কুরোদ্গমের একটা সঠিক সময় থাকে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে তার অঙ্কুরোদ্গম যদি সঠিক সময়ে না হয়, তা হলে সে বীজের মহীরূহে পরিণত হওয়ার সুযোগ নিতান্তই সীমায়িত হয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষা পর্ব সমাপনান্তেই যে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করতে হবে, এমন ধারণা নিতান্তই অমূলক। সাহিত্যরচনা কর্মের শুভারম্ভ ছাত্রাবস্থায়ই অবশ্যকৃত্য। রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পূর্বেই সাহিত্যকর্মে ব্রতী হন। বলা যায়—— রবীন্দ্রনাথের মুখে বাক্য ফোটার আগেই কলমে কাব্য ঝরেছে।

ঊষর ভূমিতে যেমন বীজের অঙ্কুরোদ্গম তথা বৃদ্ধি যথাযথ হয় না, তেমনি ছাত্রছাত্রীর সাহিত্য সম্ভবনার যথার্থ প্রস্ফুটন ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত বাতাবরণ ও সুযোগ আবশ্যক। বলা বাহুল্য কলেজ পত্রিকা সে সুযোগ করে দেয়। তাছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বিভাগের দেওয়াল ম্যাগাজিন। তবে যা দরকার তা হল সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীদের সংকোচ ও নির্লিপ্ততা পরিহার করে প্রবুদ্ধচিত্তে এগিয়ে আসা। কথায় বলে, 'গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন'। অনুরূপ ভাবে 'লেখতে লেখতে লেখক' কথাটা মোটেই সারসত্যহীন নয়। লেখার অভ্যেস অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলে কিছু না কিছু লেখা বেরিয়ে আসবেই।

গত বছর লেখার অপ্রতুলতাহেতু কলেজ পত্রিকার প্রকাশন সম্ভব হয়নি। আনন্দের বিষয়, এবার কলেজ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। তবে আগামীতে ছাত্রকুলের কাছ থেকে অধিক পরিমাণে সাহিত্যধর্মী লেখা উপলব্ধ হবে, এই আশা রইল।

সাহিত্য শান্তি ও সংহতির দ্যোতক। সাহিত্যানুরাগ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী যত বেশি সাহিত্যকর্মে ব্রতী হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশে ততবেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কলেজ পত্রিকা আগামীদিনে কলেজের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনে এক অতিশয় তাৎপর্যবাহী ভূমিকা পালন করবে, এই আশা রাখি এবং পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এবছরের পত্রিকাটির সার্থক রূপদানে যাঁদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাছাড়া চলিত শিক্ষাবর্ষে নানাবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে কলেজের নিয়মানুবর্তিতা, অনুশাসন, শৈক্ষিক পরিবেশ তথা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে যে অকৃত্রিম কর্মপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তার জন্য কলেজ পরিবারকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

অরুণ কুমার সেন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

STAFF OF NABIN CHANDRA COLLEGE, BADARPUR
ACADEMIC SESSION 2009-2010

ADMINISTRATIVE STAFF

Sri Arun Kumar Sen, M.A.	:	Principal i/c

FACULTY OF ARTS

Department of Arabic

1. Dr. Mahtabur Rahman, M.M, M.A, Ph.D.	:	Sr. Lecturer & Head of the Deptt.
2. Dr. Fazlur Rahman Laskar, M.M., M.A. (Gold Medalist), Ph.D.	:	Sr. Lecturer
3. Abu Tahir Mahmood, M.A (Gold Medalist), M. Phill.	:	Lecturer
4. Md. Hussain Ahmed, M.A. (NET) M.Phill, PGDTA	:	Part-time Lecturer

Department of Bengali

1. Sri Bishnu Chandra Dey, M.A. (NET)	:	Lecturer & Head of the Deptt
2. Dr. Arjun Chandra Debnath, M.A, M.Phill, Ph.D.	:	Lecture
3. Dr. Barnasree Bakshi, M.A, M.Phill, Ph.D.	:	Lecturer
4. Dr. Shibtapan Basu, M.A (Double), B.Ed, Ph.D.	:	part-time Lecturer
5. Miss Sushmita Nath, M.A, M.Phill	:	Part-time Lecturer

Department of Economic

1. Sri Arun Kumar Sen, M.A.	:	Sr. Lecturer & Head of the Deptt.
2. Sri Ananta Pegu, M.A. (NET)	:	Lecturer
3. Sri Soumitra Choudhury, M.A. (NET)	:	Lecturer
4. Dr. Nazim Uddin Khadem, M.A., Ph.D.	:	Lecturer
5. Md. Sorwar Alam Khan, M.A.	:	Part-time Lecturer

Department of English

1. Sri Tapan Kumar Chakraborty, M.A.	:	Sr Lecturer
2. Sri Rajat Bhattacharja, M.A., M.Phill, DCE, PGDTE	:	Sl. Grade Lecturer & Head of the Deptt.
3. Dr. Paulore. V.D., M.A., M.Phill, PGDTE, Ph.D	:	Sl. Grade Lecturer
4. Dr Mortuja Hussain, M.A., Ph.D.	:	Sr. Lecturer
5. Md. Sakil Ahmed, M.A.	:	Part-time Lecturer

Department of History

1. Sri Priya Ranjan Nath, M.A.	:	Sl Grade Lecturer & Head of the Deptt.
2. Sri Sontosh Kumar Dey, M.A.	:	Sr. Lecturer
3. Md. Monjural Haque, M.A., M.Phill.	:	Lecturer

Department of Political Science

1. Sri Debajyoti Dasgupta, M.A., LL.B.	:	Sr.Lecturer & Head of the Deptt.
2. Ms. Babli Paul, M.A., M. Phill, LL.B.	:	Lecturer
3. Sri Maheswar Deka, M.A. (SLET)	:	Lecturer
4. Sri Joy Prakash Sarma, M.A.	:	Part-time Lecturer

FACULTY OF COMMERCE

Department of Commerce

1. Joynal Abedin Tapader, M. Com.	:	Lecturer & Head of the Deptt.
2. Md. Hedayatullah Choudhury, M. Com.	:	Lecturer PG Dip. in Journalism & Mass Comm.
3. Ms. Nandita Dutta, M. Sc. (Maths) Lecturer		
4. Md. Ikbal Uddin Tapadar, M. Com.	:	Lecturer
5. Sri Kajal Kanti Nath, M. Com.	:	Lecturer

FACULTY OF SCIENCE

Department of Science

1. Md. Nurul Huda Choudhury, M. Sc. (Physics), B.Ed.	:	Lecturer
2. Md. Bilal Ahmed, M. Sc. (Chemistry)	:	Lecturer
3. Sri Biplab Karmakar, M. Sc. (Maths)	:	Lecturer
4.Mis Supriya Das, M. Sc. (Ecology & Envrl. Sc.)	:	Lecturer

LIBRARY SECTION

1. Sri Sankar Kumar Chakraborty, M.A (Bengali), M. Lib & Inf.	:	Sc Sr Librarian
2. Sri Barun Kanti Paul, B.A.	:	Library Asstt.
3. Sri Sandip Chakraborty, B.A.	:	Library Bearer.

YOGA AND GYMNASIUM STAFF

1.
2.

OFFICE STAFF

1. Sri Debasish Chakraborty	:	Head Office Asstt.
2. Sri Sekhar Das	:	Office Asstt.
3. Md. Abdul Hakim	:	Office Asstt.
4. Sri Kaushik Chakraborty	:	Office Asstt.
5. Sri Sudarshan Chakraborty	:	Honry. Office Asstt.
6. Md. Safique Uddin Ahmed	:	Gr. IV (Head Peon)
7. Md. Luthfur Rahman	:	Gr. IV
8. Sri Bimal Paul	:	Gr. IV
9. Sri Amal Das	:	Gr. IV (Night Guard)
10. Sri Debasish Das	:	Gr. IV (Day Guard)
11. Sri Rajendra Basfor	:	Gr. IV (Safoiwala)

ছাত্র রাজনীতি ঃ স্বরূপ ও শুদ্ধিকরণ

অরুণকুমার সেন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি বাঞ্ছনীয় না বর্জনীয়, এ নিয়ে বিতর্ক মোটেই নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক কালে ওই বিতর্ক এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। একদিকে ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধাচারীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে সরব, অপরদিকে এর পক্ষাবলম্বীরা ছাত্ররাজনীতির পরিসর বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে স্কুলস্তর অবধি সম্প্রসারণের পরিকল্পনায় সচেষ্ট।

ছাত্ররাজনীতির সমর্থন

বর্তমান ছাত্রই ভবিষ্যতের রাষ্ট্রচালক। সুতরাং রাষ্ট্রচালনার নীতি অর্থাৎ রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞানের অনুশীলন ছাত্রাবস্থায়ই হওয়া আবশ্যক। তাই ছাত্ররাজনীতির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত ও ছাত্র সমাজ—এই দুয়ের সংশ্লিষ্টতা অবশ্যই সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার নয়, ইতিহাস এর সাক্ষ্যবাহক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এরূপ অনেক উদাহরণই লিপিবদ্ধ আছে। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংঘটিত অনেক আন্দোলনেই ছাত্রসমাজের ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আমরা অবহিত। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা গান্ধীজির অসহযোগ অন্দোলনের পুরোভাগে থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আরও অনেক আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীর সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। কাজেই ছাত্ররাজনীতি বা ছাত্রছাত্রীর রাজনৈতিক আন্দোলন-ঘটনাবলীতে জড়িত হওয়াটা নিন্দনীয় বা সমালোচনার বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়া ঠিক নয়।

ছাত্ররাজনীতির সমর্থকদের বক্তব্য, রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখে রাজনীতির পাঠগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি করতে হবে ছাত্রাবস্থাতেই। রাজনীতিতে অনীহা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ রাজনীতিজ্ঞ হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই ছাত্ররাজনীতির আবশ্যকতাকে মোটেই খাটো করে দেখা যাবে না। আর এজন্যই ছাত্ররাজনীতির পরিসর বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে স্কুলস্তর অবধি প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এর প্রবক্তারা।

ছাত্ররাজনীতির বিরোধিতা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির বাড়বাড়ন্ত লক্ষিত হলেও তথাকথিত ছাত্রনেতারা ছাত্রকুলের প্রকৃত হিতার্থে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন পাঠনের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে সুস্থ শৈক্ষিক পরিবেশ তৈরীতে একেবারেই বীতস্পৃহ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির কদর্যরূপ দীর্ঘদিন ধরেই প্রতীত হচ্ছে। রাজ্যিক বা জাতীয় স্তরের দলীয় রাজনীতির ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবেই ছাত্ররাজনীতি পরিচিতি লাভ করেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির লাগাম এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মুঠোয়। কলেজগুলিতে ইউনিয়ন দখলের লড়াইয়ে ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব মতামতের চেয়ে দলীয় কর্মী তথা পেশী ও অর্থবলধারীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও দাপট অধিক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। এতে ছাত্রস্বার্থ চূড়ান্তরূপে উপেক্ষিত হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলি কৌশলে তাদের দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির কাজটা সেরে নিতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক দলের ক্যাডারবাহিনী তৈরীর কারখানা হয়ে উঠে কলেজগুলি। যদিও রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্ররাজনীতির সপক্ষে নানা আদর্শবাদ, ছাত্রসমাজে রাজনৈতিক সচেতনতার জাগৃতি তথা তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনেতার গুণাবলির অনুশীলন ইত্যাদির কথা বলেন, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে ছাত্রদের মধ্যে নিজ নিজ দলের প্রভাববৃদ্ধি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অর্থের ছড়াছড়ি, মার-দাঙ্গা, অপহরণ, খুনখারাবি কিছুতেই আপত্তি নেই তাদের। স্বভাবতই ছাত্রনেতা হিসেবেও তারা এমন প্রার্থীকেই অগ্রাধিকার দেন, যারা উপরোক্ত কর্মকাণ্ডে সিদ্ধহস্ত বা সামান্য প্ররোচনাতেই তা অবলীলাক্রমে করতে সক্ষম। যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার চেয়ে দাদাগিরিকেই প্রাধান্য দেয়, তারাই ছাত্ররাজনীতির যোগ্যতা অর্জনে বহু যোজন এগিয়ে থাকে। এধরনের ব্যাপারই প্রায় সর্বত্রই ঘটছে। এই অবাধ কূট দলীয় রাজনীতির কুৎসিত অবয়ব দর্শনেই সুভবুদ্ধিসম্পন্ন অভিভাবক নাগরিক শঙ্কিত হয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির অবসান চান। সুশীল কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের দলীয় রাজনীতির সংস্রবমুক্ত রাখা উচিত। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ সম্পর্কে যথোচিত ওয়াকিবহাল না হওয়ায় সহজেই রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় বিপথগামী হতে পারে। যে ছাত্রজীবন ভবিষ্যতে শিষ্ট নাগরিক হওয়ার গণাবলি

অধ্যয়ন ও আয়ত্ত্বের সময়, সেটা কলুষিত হতে পারে যদি তারা এঅবস্থায়ই অর্থশক্তি পেশীশক্তি নির্ভর রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করে। সর্বোপরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বোধে চিড় ধরিয়ে শৈক্ষিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এরূপ পরিস্থিতি থেকে সব রাজনৈতিক দলই যে সমানভাবে স্বার্থ সিদ্ধিতে সমর্থ হবে তা নয়। মূলত ভ্রষ্টাচার আশ্রিত দলই এতে সর্বাধিক লাভবান হবে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কলেজে এধরনের ছাত্ররাজনীতি কেন্দ্রিক ইউনিয়নের দখলদারি ও খবরদারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য পঠনপাঠনের ব্যাপারটাকেই প্রহসনে পরিণত করছে। যদিও কলেজে দলবাজি–ইউনিয়ন বাজিতে শতকরা বড়জোর পাঁচ ভাগ ছাত্রই জড়িত থাকে, কিন্তু তাদের দাপট ও দৌরাত্মে বাকি পঁচানব্বই ভাগ ছাত্রেরই পড়াশোনায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এরফলে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকশিক্ষিকার দায়িত্ব পালনেও দায়সারা ভাব পরিলক্ষিত হয়। সুশীল ছাত্র ও সচেতন অভিভাবক নোংরা রাজনীতির সংক্রমণ ক্লিষ্ট শৈক্ষিক পরিবেশ নিয়ে চরম হতাশাগ্রস্থ হোন। অর্থ ও বাহুবলে বলীয়ান রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট ছাত্ররাজনীতিতে অনৈতিকতা, হিংসা, উন্মত্ততা, জবর আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব প্রকট হওয়ায় ছাত্রহত্যা–শিক্ষকহত্যার মতো নিকৃষ্ট ঘটনা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতাকে কালিমালিপ্ত করছে। এই সর্বনাশা ছাত্ররাজনীতির থেকে পরিত্রাণ ও উত্তরণের জন্য ছাত্ররাজনীতির অবসানই চাইছেন অনেকে। আমাদের এ অঞ্চলের অবস্থা তুলনামূলক ভাল হলেও অনেক রাজ্যেই ছাত্ররাজনীতি বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করেছে।

দল–নিরপেক্ষ ছাত্ররাজনীতি

ছাত্ররাজনীতিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এককভাবে দায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কদর্য দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ। কাজেই যেটা বন্ধ হওয়া দরকার সেটা ছাত্ররাজনীতি নয়, ছাত্ররাজনীতিতে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ। ছাত্ররাজনীতির প্রচলিত ধারণার সংশোধন আবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই সীমায়িত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি থাকবে, ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা করবে – এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব তথা নেতৃত্বশক্তির বিকাশ ঘটবে যা পরবর্তীতে সমাজ ও রাষ্ট্রচালনায় সহায়ক হবে। এটাকে সার্বিক শিক্ষার এক অঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। রাজনীতি শব্দকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা না করে তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হবে। রাজনীতি নিছক কোনও রাজনৈতিক দলের নীতি নয়, রাজনীতি হলো রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি। কাজেই ছাত্ররাজনীতি দল–নিরপেক্ষ রাজনীতি হওয়াই উচিত। এক্ষেত্রে সমগ্র ছাত্র সমাজই দল। এই ছাত্রসমাজকে নেতৃত্ব দেওয়াই ছাত্রনেতার কাজ আর ছাত্র সমাজকে পরিচালনা করার নীতিই ছাত্ররাজনীতি। রাষ্ট্র রাজনীতির হাতেখড়ি হবে এই ছাত্ররাজনীতি।

ছাত্রনেতাদের কোনও রাজনৈতিক দলের স্তাবকতা বা তল্পিবহন করা ছাত্রসমাজের পক্ষে অমর্যাদাকর ও হানিকর। এটা ছাত্রনেতাদের অন্তর্নিহিত নেতৃত্বগুণের বিকাশকে স্তিমিত ও বিকৃত করে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে। রাজনৈতিক নেতারা তাদের ন্যস্ত স্বার্থ চরিতার্থ করতে ছাত্রদের হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করেন। তাছাড়া ছাত্রাবস্থায়ই সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার মোটেই ঔচিত্য বা আবশ্যকতা নেই। ছাত্রাবস্থা নেতৃত্বগুণ অনুশীলন ও অর্জনের সময়—দলগত রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার সময় নয়। শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শের তুলনামূলক বিচার সাপেক্ষে পছন্দের দলে নিজের অন্তর্ভুক্তি কাম্য। এধরনের ছাত্রনেতা রাজনৈতিক দলকেও সমৃদ্ধ করেন। অপরদিকে ছাত্রাবস্থায়ই যারা রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়, তারা ভবিষ্যত জীবনে কখনও সৎ ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। দুর্নীতি দিয়ে যার হাতেকড়ি, সে ভবিষ্যতে চরম দুর্নীতিগ্রস্থ ও দুরাচারী হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এটাই যে বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনার এক প্রধান কারণ, তাও বলা বাহুল্য।

বর্তমানে এদেশের গরিষ্ট সংখ্যক রাজনৈতিক দল বা নেতার চরিত্রে অনুকরণযোগ্য আদর্শের দৈন্যদশা চরমে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক চরম অবক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলাহীনতার প্রতিচ্ছবির বহিঃপ্রকাশ সংসদ–বিধানসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তর অবধি অতি নগ্নরূপে দৃষ্ট হচ্ছে। এরূপ দল–নেতার সংস্রবমুক্ত থাকাই ছাত্রসমাজের জন্য মংগলদায়ক।

ছাত্ররাজনীতির শুদ্ধিকরণ

ছাত্রস্বার্থ তথা বৃহত্তর শিক্ষারস্বার্থে ছাত্ররাজনীতিকে দলীয় রাজনীতির কবলমুক্ত করার প্রয়াস ও তৎপরতা সাম্প্রতিক কালে

এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ছাত্ররাজনীতির শুদ্ধিকরণে অগ্রনী ভূমিকা পালনে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর পূর্বে এইমর্মে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা 'ক্লাসটপার' বা 'ফার্স্টবয়' হবেন; শিক্ষা–সঙ্গীত–খেলাধূলা ও মেধাবিকাশের অন্যান্য বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসই হবে ইউনিয়নের কাজকর্মের বিষয়; দলীয় রাজনীতির হানিকর সংক্রমন থেকে ইউনিয়নের কাজকর্মকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে ইত্যাদি। অবশ্য এরূপ নির্দেশিকাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনধিকার চর্চা ও অন্যায় 'ফতোয়া' আখ্যা দিয়ে বিষয়টি মামলা আকারে সুপ্রিম কোর্টে নীত হয়। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন নির্বাচনে অর্থ ও পেশীশক্তির দৌরাত্ম নিয়ন্ত্রণ করতে কমিটি গাইডলাইন তৈরী করবে যেখানে বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে ঃ নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে আবশ্যকীয় যোগ্যতা; কী কী কারণে একজন ছাত্র নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না; নির্বাচনের প্রচারকার্যে খরচের সর্বোচ্চ পরিমান ও তার উৎস; রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট ছাত্রছাত্রীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণা করা ইত্যাদি। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, 'We have to fix some eligibility criteria for student candidates. It is found that some student leaders go on staying in the same institution not for studies but for some other political reasons.'

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ ইংরেজির নির্দেশানুসারে ভারতের মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রনালয় অবসৃত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জে. এম. লিংডো–র নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করে। ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে লিংডো কমিটি যে রিপোর্ট জমা করে তার সুপারিশগুলি সুপ্রিম কোর্টের স্বীকৃতি লাভ করে। সুপ্রিম কোর্ট ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইংরেজি এক আদেশে ওই সুপারিশগুলির সত্বর রূপায়নে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। লিংডো কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে প্রধান কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো।

এক ঃ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন এবং ইউনিয়নে প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক দল–নিরপেক্ষ হতে হবে।

দুই ঃ কলেজস্তরে ১৭ থেকে ২২ বছর বয়সসীমার মধ্যেকার ছাত্রছাত্রীই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

তিন ঃ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বছরে প্রার্থীর কোনও 'অ্যাকাডেমিক এরিয়ার' থাকতে পারবে না, অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঠক্রম সফলভাবে সম্পূর্ণ করে আসা ছাত্রছাত্রীই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

চার ঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক ছাত্রের ক্লাসে উপস্থিতির হার বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত হার অথবা পঁচাত্তর শতাংশের মধ্যে যেটা অধিক সেটা হতে হবে।

পাঁচ ঃ অতীতে যে কোনও ধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

ছয় ঃ কেবলমাত্র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও পূর্ণকালীন ছাত্রছাত্রীই ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

সাত ঃ ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমান নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

আট ঃ নির্বাচনী প্রচারে কোনও ধরনের ছাপা পোষ্টার ব্যানার ইত্যাদির ব্যবহার তথা জনসভা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র হাতে লিখা পোষ্টারের সীমিত ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্ম লেকচার অনুমোদনযোগ্য।

নয় ঃ পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া দশদিনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

লিংডো কমিটির সুপারিশগুলি যথাযথভাবে গৃহীত ও রূপায়িত হলে ইউনিয়ন নির্বাচনে একদিকে যেমন প্রকৃত 'ছাত্রত্ব' অর্জনকারীই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে, তেমনই অপরদিকে মোবাইল–মোটর বাইক–মৌজ–মহিলা আদি 'ম'–আসক্ত স্বঘোষিত ছাত্রনেতাদের বাতিলের তালিকায় চলে যাবে।

লিংডো কমিটির সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য সরকারি নির্দেশ তথা সুপ্রিম কোর্টের আদেশের প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছে। ওইসব সুপারিশ–পরামর্শের আলোকে কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন নির্বাচন সম্পন্ন করা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে কর্তৃপক্ষের সততাপূর্ণ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুস্থ শৈক্ষিক পরিবেশ বহাল রাখতে সহায়ক হবে এবং ছাত্ররাজনীতিও অনেকাংশে সুফলদায়ী ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।■

ডায়াসপোরিক ইতিকথা ও বাঙালি ডায়াসপোরিক লেখক বৃত্তান্ত

বিষ্ণু চন্দ্র দে,
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

'ডায়াসপোরা' বা 'ডায়াসপোরিক' নামক একটি গ্রীক শব্দ বহুদিন যাবৎ আমাকে তাড়া করে চলেছে। যাঁরা দেশি বিদেশি সাহিত্য তুলনামূলকভাবে খুব বেশি জ্ঞান-ভাঁড়ে চালনা করেন এবং সেখান থেকে আধুনিক হাইব্রিড চিন্তা বাংলায় রোপন করেন তাঁদের পক্ষেই ডায়াসপোরিক ব্যাপারটা উজ্জ্বল।

'ডায়াসপোরিক' বা 'ডায়াসপোরা' কী এবং শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে সে সম্বন্ধে মলয় রায়চৌধুরী 'ডায়াসপোরিক অধুনান্তিকতা'-য় লিখেছে - "Diaspora শব্দটি গ্রিক এবং তা দুটি গ্রিক অভিব্যক্তির বন্ধনে তৈরি, তা হল Dia অর্থাৎ ভেতর থেকে এবং Speirein অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়া যা মানে করলে দাঁড়ায় এমন ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠী যাঁরা নিজের গোষ্ঠীর ভূখণ্ড থেকে বিচ্যুত বা উৎপাটিত বা বিতাড়িত বা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন বা যাঁদের দেশের বাড়ি নেই।"

ডায়াসপোরিক ইতিহাস লুফে নিলে যা বেরিয়ে আসে তার ছোটখাটো একটা ডকিউমেন্টারি চলচ্চিত্র দেখা যাক ঃ Diaspora শব্দটি গ্রিকরা উদ্ভাবন করলেও আসলে ইহুদিদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার প্রয়োগ ঘটেছিল। ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্যালেস্টাইনের অধীনে ব্যবিলন চলে গেলে ইহুদিরা স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। পুনরায় রোমের সম্রাট মার্কাস উলপিয়াস ত্রাজানাস জেরুজালেম নিজ হস্তগত করে ইহুদি পুরোহিতদের দেশত্যাগী করেন। আরও ৬৫ বৎসর পর ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে সম্পূর্ণ ইহুদি জনজাতিকে বাস্তুভিটা হারাতে হল। এভাবে দীর্ঘ বছর ধরে ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গেলে স্বভাবতই সে দেশের ভাষা সংস্কৃতি ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রক্তগত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ভিন্ন ভাষা-ভাষির মানুষ এক মঞ্চে জীবন নাট্যে অভিনয় করতে গেলে তারা একে অপরের সমস্ত কিছুই অন্তরে বিশুদ্ধিকরণ করতে বাধ্য।

ইহুদিদের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনযাপন পদ্ধতি পৃথিবীর প্রায় দেশেই তখন ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দীর্ঘদিন কোনো জাতিকেই এভাবে স্বভূমি ত্যাগ করে পরভূমিতে আস্থানা রচার প্রয়োজন হয়নি। যদিও অখণ্ড ভারতবর্ষে ১২০২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনানায়ক ইফতিকার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজির তাণ্ডবে বাংলা তথা পূর্ব-ভারতের বুকে ভারি রকমের তছনছ হয়েছিল। মানুষ তখন বাস্তুহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। দ্বিতীয়বার নিজের দেশ ছেড়ে জোর করে হোক কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় নেতারা অর্থাৎ ব্রিটেন প্রধানরা তাদের দেশের মানুষদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার করে দেয় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে। এমন ঘটনা সপ্তদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হলেও দীর্ঘ বৎসর তার গতি থামেনি। মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন — "উপনিবেষবাদ, ইউরোপীয় সমাজের পক্ষেও ছিল এক ছত্রভঙ্গকারী ডায়াসপোরিক ঠাঁইবদল, যা লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয়দের ইউরোপ ছেড়ে সারা পৃথিবীতে এমনভাবে পুঁতে দিয়েছে যে তারা তাদের নিজেদের ভূখণ্ড থেকে চিরকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং আদি নিবাস সম্পর্কে তাদের উত্তরপুরুষরা আগ্রহহীন।"

ইহুদিরা নিজ দেশ ত্যাগ করলেও তাদের ধর্ম ঠিক ছিল। কিন্তু যারা কৃতদাস হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার হয়েছিল তারা নিম্নবর্গের হওয়ার ফলে এবং শিক্ষা-দীক্ষার আলোক যাদের মস্তিস্কে টিমটিম পরিমাণও ছিল না তারা গতদিনের সকল ব্যথা গাথা ভুলে গিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে আফ্রিকা, কেনিয়া, ব্রাজিল, ওয়েস্টইণ্ডিজ, ফিজি, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি। কিছু মানুষ বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করার জন্য কিংবা ব্যবসা করার জন্য কিংবা চাকরির তাগিদে অন্য দেশে বাস করছে স্বইচ্ছায়। তারা চায় ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতি, ফ্রান্স-ভাষা সংস্কৃতি, উর্দু-ভাষা সংস্কৃতি অমৃত স্বরূপ আস্বাদন করতে। তার মূল কারণ বর্ধিত জনসংখ্যা।

আমরা সমস্ত ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে যা পাই — তাতে ভারতবর্ষে এত জনসংখ্যা ছিল না। এখন আমরা জানি ভারতবর্ষের বুকেই সবচেয়ে বেশি ভাষা গোষ্ঠির মানুষ বাস করে। কিন্তু যারা এ দেশের স্থায়ী ভাষা-গোষ্ঠির মানুষ বাস করে। কিন্তু যারা এ-

দেশের স্থায়ী ভাষা-গোষ্ঠির মানুষ তারা সংখ্যায় অল্প হওয়ার ফলে, তাদের সাহিত্য না থাকার ফলে, তারা প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অথবা লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ওপর প্রতিপত্তিশালী কিংবা বলা যায় বহিরাগত জনগোষ্ঠির জোর বেশি। বহিরাগত নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের ভাষা-সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে কৌশল প্রক্রিয়ায় বা জোর করে। যেমন — তুর্কি বা পাঠান-মোগল বা এরা দেশে রাজত্ব করার সময় তাদের ভাষা-সংস্কৃতি ধর্ম বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই উগ্রজাতীয়তাবাদীদের ধর্ম-সংস্কৃতি ভাষা যারা গ্রহণ করেছে তারা নিজের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত হওয়ার ব্যাপারে রক্ষা পেয়েছে, আর যারা তা মেনে নেয়নি তারা উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে ভারতের এ প্রান্ত ও প্রান্ত। ইংরেজদের রাজত্বকালেও ভারতীয়রা নিজেদেরকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে রক্ষাকল্পে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে হয়েছে কিন্তু সর্বত্র তাদের প্রভাবের কাছে পেরে ওঠা যায়নি। তাই পার্বত্য অঞ্চলগুলো অর্থাৎ অনুসূচিত জনজাতি (Tribal)-দেরকে কৌশলে লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ইংরেজদের রাজত্বকালে মানুষকে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে কাজের তাগিদে। তারপর ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাগমুহূর্তে মানুষ বাস্তুভিটা হারায় রাজনৈতিক কারণে।

বোধহয় অখণ্ড ভারতবর্ষের বুকে এবং বর্তমান ভারতবর্ষের বুকেও সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত জাতি বাঙালি। বাঙালি শিক্ষিত জাতি, উন্নত মস্তিষ্ক, তাদের ভাষা-সংস্কৃতি উন্নত থাকার ফলেও এই জাতি ডায়াসপোরা। কিন্তু এই বাঙালি জাতির সন্ধান মেলে বহু হাজার বছর আগে। বাঙালি চিরদিন শান্তিপ্রিয়, হার্দিক, ঐক্যবদ্ধ, এদের স্বভাব বিরুদ্ধ এবং বাহুবলে এরা বড় বেশি দুর্বল। এই কয়েকটা কারণে বাঙালি অত্যাচারিত, উদ্বাস্তু এবং ডায়াসপোরা। ভারতবর্ষের বুকে দ্বিতীয় জাতি ভোজপুরী (হিন্দিভাষী)—যারা স্বইচ্ছায় নিজের স্বভূমি ছেড়ে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর মূল কারণ — বুদ্ধিহীনতা, অশিক্ষা, বাহুবলি, পরিশ্রমী সহজ সরল, বিনয়ী এবং তারা পেটের তাগিদে ডায়াসপোরা। অন্যান্য জাতিদের মধ্যে মারবাড়ী এবং গুজরাতীরা বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে আসার মূলে স্বভূমিতে উৎপাদন বন্ধ্যাত্ব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একমাত্র বাঙালি ছাড়া অন্যান্য ভাষা-গোষ্ঠির মানুষ যারা স্বভূমি ছেড়ে অন্যত্র আস্থানা রচলেও পিতৃ-পুরুষের ভূমির প্রতি তাদের দখলদারি কাগজ কলমে অবশ্যই রয়েছে। কেননা তারা স্বপরিবারে দেশভূমি-জন্মভূমি-পিতৃভূমি ত্যাগ করে না। কিন্তু তারাও ডায়াসপোরা।

ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যে দেশে বহিরাগত জাতির আগমন হয়েছে বারবার। ভারতবর্ষের ভাষা-সংস্কৃতি তারা অন্তর দিয়ে আস্বাদন করেছে এবং তাদের ভাষা সংস্কৃতিকে মিশিয়ে আলাদা ভাষা-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এই ভারত ভূমিতে নানা জাতির মিলনপীঠ গড়ে ওঠার ফলে ডায়াসপোরা দেশ বলে পরিগণিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন —

"শক হূন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"....

দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষকে ধ্বংস করার মূলে ধর্মীয় কুচক্র এবং হিন্দু-মুসলমানদের দ্বন্দ্ব। ইংরেজরা যখন উপনিবেশ ত্যাগ করে তখন তারা ধর্মের কোন্দল লাগিয়ে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে যায়। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা তাদের জায়গা জমি ছেড়ে পালিয়ে এলো। যে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আসতে বাধ্য হন তাদের কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আস্থানা গড়তে বাধ্য হলেন। এরা ডায়াসপোরা বা ডায়াসপোরিক বাঙালি। এককথায় এরা ইনার ডায়াসপোরিক বাঙালি।

দুধরনের ডায়াসপোরিক বাঙালি লেখকের আত্মপরিচয় আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। দেশভাগের পূর্বেকার বাঙালি লেখক এবং দেশভাগের পরবর্তীকালে পালিয়ে আসা বাঙালি লেখক। খ্যাতিমান ইনার ডায়াসপোরিক লেখকের তালিকায় রয়েছেন — রবীন্দ্র গুহ, অজিত রায়, সুবিমল বসাক, দীপঙ্কর দত্ত, বিশ্বজিৎ সেন, কমল চক্রবর্তী, বারীন ঘোষাল, তেজেন্দ্রলাল মজুমদার, শিবব্রত দেওয়ানজী প্রমুখ। খ্যাতির দিক থেকে রবীন্দ্র গুহ (১৯৩৪-২৫ অক্টোবর) একাই ডায়াসপোরিক লেখকের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দ্রোহপুরুষ। যদিও এই খ্যাতিমান দ্রোহপুরুষ অধুনান্তিকতার রূপকার ডায়াসপোরিক চিন্তা জগতে অগ্রসর হওয়ার আগে ধারাবাহিক আধুনিক সাহিত্য চিন্তায় নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিলেন। সেই সৃষ্টিগুলো হল — রাজপুতানার ইতিকথা (উপন্যাস / ১৯৬৫), প্রেম আতঙ্কে সন্ত্রাস (উপন্যাস / ১৯৬৬), পদধ্বনি প্রতিধ্বনি (উপন্যাস / ১৯৬৬) মেবারের পতন (উপন্যাস / ১৯৬৭) ইত্যাদি।

তাঁর এই লেখায় হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে যখন তিনি ইনডাসট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কীয় গবেষণার কাজে সুদূর দিল্লিতে পাড়ি দিলেন। অবসর সময় অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠির মানুষের জীবনযাত্রা ও সমস্যা দেখতে দেখতে জন্ম নিল ডায়াসপোরিক চিন্তাবীজ। একে একে আত্মপ্রকাশ হল — রবীন্দ্র গুহর কবিতা, নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৪), দরিদ্র যুবরাজ (১৯৯৬) ইত্যাদি। আর্থসামাজিক বৈষম্য, হিংসা, অনাচার, যৌনলিপ্সা ইত্যাদির ফলে হরিয়ানভি জাঠগুজার যাদব চূড়াচামারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিংবা একে অন্যের প্রতি যে ঘৃণনীয় দৃষ্টি প্রক্ষেপন তারই ইতিবৃত্ত 'শিকঞ্জের পাখি খামোশ' (২০০১) উপন্যাস। পরের আত্মপ্রকাশ বিখ্যাত ডায়াসপোরিক কবিতা গ্রন্থ 'হাসান তারিকের রূপালী ইলিশ' (২০০৩) ইত্যাদি।

ডায়াসপোরিক সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল —

(১) লেখক তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে একটি বিশেষ সন্দেশ উপস্থাপন করবেন এবং যা হবে শিল্প সম্মত কারিগরিগত।
(২) মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদার পাশাপাশি অন্য যে ভাষার সংযোগ তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপন করবেন তা যেন যৌগিক-পতিস্ব হয়ে ওঠে।
(৩) বিশেষত সাহিত্যের চরিত্র হবে মাতৃভাষার বিপরীত ভাষা-গোষ্ঠির।
(৪) নতুন নতুন বিভাষিক শব্দ-যোজন।
(৫) স্বসৃষ্ট শব্দ প্রসব।
(৬) ডায়াসপোরিক রচনা প্রতিষ্ঠাকল্পে লেখক নিজের চতুর্দিকের জৈব-জগৎ সম্পর্কে সতর্ক থাকেন।
(৭) ডায়াসপোরিক সাহিত্যে সাহিত্যিক কলাকৌশল ব্যক্তিগত।
(৮) তিক্ত পরবাসের অভিজ্ঞতার বাস্তবচিত্র-চিত্রন।
(৯) ডায়াসপোরিক সাহিত্যে দ্বিভাষিক শব্দ ও বাক্য কথনে বাক্‌জাগতিক টেনশন গড়ে ওঠার ফলে পাঠবস্তুকে ডায়াসপোরিক করে তোলে।
(১০) যৌন জগৎ উঁকিঝুঁকি।
(১১) আনসেটলড লেখক সত্তার উত্তপ্ত শিল্প প্রকাশ।
(১২) মিশ্র ভাষার বাক্য গঠন।
(১৩) সাতমিশেলি সংলাপ যোজন।
(১৪) ডায়াসপোরিক সাহিত্য সৃষ্টিতে কলাকৌশল আবশ্যক যা পাঠকের কাছে নতুন অর্থাৎ যা ডিফ্যামিলিয়ারাইজড আকারে উঠে আসে।
(১৫) নতুন নতুন আঙ্গিকের মাল্য যোজনা।
(১৬) শব্দের সংকরায়ন, যা পাঠদেহে ডায়াসপোরিক অবদান (মিলিজুলি ভাষা)।
(১৭) প্রতিষ্ঠান বিরোধী চিন্তা।
(১৮) আঙ্গিকগত দিক থেকে উক্তি সন্দর্ভ একক মনে হলেও তাতে একাধিক কণ্ঠের প্রকাশ।
(১৯) ডায়াসপোরিক রচনায় বহিরবঙ্গ অর্থাৎ ভৌগোলিক স্থান হল চিন্তা ভূখণ্ড।
(২০) দুর্দশাগ্রস্ত সংকটের লড়াই ডায়াসপোরিক রচনার বিষয়বস্তু, ইত্যাদি।

আমরা বুঝতে পারছি ডায়াসপোরিক লেখায় রয়েছে মাতৃভাষা এবং অন্য ভাষার যোগসূত্র স্বরূপ দ্বিভাষা গোষ্ঠির অন্দরমহলের সমাজ পরিসরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনাঘন রেসলালা। যদিও পাঠক্রিয়ায় হোঁচোট আসে লোলুপ ঘ্রাণ নিয়ে। একথা সত্য যে যাঁরা বাংলায় বসে ডায়াসপোরিক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন তাঁদের লেখায় বহিরবঙ্গের মানুষের সমস্যার কথা থাকলেও তা কল্পনাগত। এবং যারা বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে জীবিকার তাগিদে স্থায়ী-অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন তাঁদের সৃষ্ট ডায়াসপোরিক সাহিত্য অবশ্যই তুলনামূলক বাস্তব হওয়া স্বাভাবিক। একথাও ঠিক যে বাংলার বাইরে বসে লিখলেই বা সৃষ্ট সাহিত্যের পটভূমি বাংলার বাইরের কোনো অঞ্চল হলেই বা বিভাষিক চরিত্রকে নিয়ে সাহিত্য হলেই তা ডায়াসপোরিক হয়ে ওঠে না। যদি না সেই লেখা গুলো উক্ত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে। যারা আনসেটলড হয়ে বহির রাজ্যে বসে ডায়াসপোরিক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন তাঁদের সৃষ্ট কলায় এসে

যাচ্ছে সাধারণত —সাঁওতালি, হিন্দি, পঞ্জাবি, ভোজপুরি, ওড়িয়া, হরিয়ানভি, অসমিয়া ইত্যাদি ভাষা। যে সমস্ত স্থান ডায়াসপোরিক সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে, তা হল — অসমের চা বাগান অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ওড়িষা বর্ডার অঞ্চল, পাটনার জাঠ গোষ্ঠিভুক্ত গ্রাম, হরিয়ানা পঞ্জাব দিল্লি উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ছত্তিছগড় ইত্যাদি অঞ্চল। সেইসব অঞ্চলের বাঙালি ও অন্যান্য ভাষার মানুষের — আর্থিক সমস্যা, জাতিগত দ্বন্দ্ব ভাষাগত সমস্যা, অনাচার, হিংসা, যৌনলিপ্সা ইত্যাদির ভয়াবহ রূপ ডায়াসপোরিক সাহিত্যের ডকিউমেন্ট।

বাংলায় ডায়াসপোরিক সাহিত্য চিন্তার সন্ধান পাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনায়। পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের পদেও ডায়াসপোরিক চিন্তা চেতনার আভাস মেলে। আরও কিছু পরে সাহিত্যে ডায়াসপোরিক চিন্তামৃতের সন্ধান মেলে অনুবাদকারদের সৃষ্ট সাহিত্যে, শাক্তপদাবলিকারের রচনায়, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ইত্যাদিতে। তারপর গদ্য সাহিত্যের শক্ত হাতে অনেকেই ডায়াসপোরিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন। যেমন - সতীনাথ ভাদুড়ী, দীপঙ্কর দত্ত, অজিত রায় প্রমুখ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ডায়াসপোরিক চিন্তা চেতনার হল্লাচিল্লা ব্যক্তি রবীন্দ্র গুহ।

পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা ভারতবর্ষে এসেছেন। বাঙালি হিন্দুরা যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বাস করছেন, ঠিক তেমনি বাঙালি মুসলমানরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বাস করছেন। হিন্দু বাঙালি অনেকেরই মস্তিস্কে ডায়াসপোরিক চিন্তা জগৎ প্রস্ফুটিত হলেও বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় প্রসবিত হয়নি কোনো ডায়াসপোরিক সাহিত্য। অথবা বলা যায়, যে মুসলমানরা ভারতবর্ষ থেকে বাস্তুভিটা ছেড়ে বাংলদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের দ্বারাও কর্ষিত কোনো ডায়াসপোরিক সাহিত্যভূমি উর্বর হয়নি। পূর্বপাকিস্তান থেকে যে হিন্দু বাঙালিরা ভারতবর্ষে এসেছেন, তারা দলবদ্ধভাবে কলনি তৈরি করলেও সর্বহারার লেবেল এদের ভাগ্য থেকে যায়নি। অসমের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে — নোয়াখালি বস্তি, ঢাকাই পট্টি, মৈমনসিংগা পাড়া, সিলেটি বস্তি, চাটগাঁইয়া পাড়া ইত্যাদি। এরা ডায়াসপোরিক চিন্তার 'যোজন ভাইরাস' অবশ্যই কিন্তু এরা শোকড়হীনতা মনের মধ্যে পোষণ করার ফলে এদের চিন্তার চিতাকাঠ থেকে যে ধোঁয়া বেরোলো তা হল —প্রবোধবন্ধু অধিকারির 'ধলেশ্বরী', দীনেশ রায়-এর 'সোনা পদ্মা', রসময় মজুমদার-এর 'নোয়াখালির দিনলিপি', প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়া পাতার নৌকা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ইত্যাদি।

একসময় পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যে বাস করা বাঙালি লেখকরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠান প্রধান লেখকদের মত লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেন। আজকের দিনে তার আমূল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে বাস করা ডায়াসপোরিক লেখকরা এখন সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়ে উঠতে সচেষ্ট হচ্ছেন। তার প্রমাণ মেলে — উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, পাটনা, ছত্তিশগড়, ওড়িষা, অসম প্রভৃতি রাজ্যের ডায়াসপোরিক লেখকদের চিন্তার ইনফ্ল্যামেশন দ্বারা। অসমের ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার নীবন লেখক গোষ্ঠির মধ্যে এধরনের একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চিন্তাবাষ্প সাহিত্যাকাশে ভাসমান হতে দেখা যাচ্ছে। এর মূল কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠান লেবেন লাগোয়া লেখক গোষ্ঠির কাছে বারবার এরা বিধ্বস্ত, অবহেলিত।

আজকের দিনে আমরা যে অধুনান্তিক বা উত্তর আধুনিক বা পোস্টমডার্ন চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চলেছি, তার বীজ বোধহয় রোপিত হয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখার মধ্যে। মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন - ''অধুনান্তিক ভাবকল্পটির বীজ ছিল ডায়াসপোরিক সন্দর্ভের মাটিতে, এবং অমনই এক নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে তার স্বাভাবিক উদ্যম।'' এখন সাহিত্যে বাঁকবদলের পথ পোস্টমডার্ন চিন্তা-চেতনা। পোস্টমডার্ন নিয়ে যাঁরা ভাবছেন, যাঁরা লিখছেন তাঁরা বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যবোদ্ধা। তাঁরা হলেন — সমীর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র গুহ, অজিত রায়, তপোধীর ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর দত্ত, সুধীর রায়চৌধুরী, সমীরণ মজুমদার, বারীন ঘোষাল, কৌশিক চক্রবর্তী, অরূপ চৌধুরী, কমল চক্রবর্তী, সুধাংশু সেন, দীপঙ্কর দত্ত এবং আরও অসংখ্যজন।

ডায়াসপোরিক লেখকদের চিন্তায় রয়েছে সাহিত্য নামক শিল্পের উন্নতি সাধন এবং বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁরা নিজের আর্থিক ক্ষতিও মেনে নেন নির্দ্বিধায়। ডায়াসপোরা চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানকালে সাহিত্যে বাঁকবদলের স্রোতধারা বইলেও প্রতিষ্ঠান আঁকড়ে ধরা বোদ্ধা মহলের ধারণা — এই স্রোতধারা অল্পদিনের। আসলে ডায়াসপোরিক চেতনা নিজেই সংকটদীর্ণ।

ডায়াসপোরিক লেখকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে প্রয়াস করছেন তারমধ্যে সংযুক্ত হচ্ছে সংকরায়িত স্থানিক শব্দ ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা শব্দ ভাণ্ডার সেই সমস্ত শব্দকে এড়িয়ে যাচ্ছে। যেখানে আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি শব্দে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ভরপুর সেখানে স্থানিক সংকর শব্দকে জায়গা দিলে বাংলা শব্দাভিধান শক্তিশালী হয়ে উঠত নির্দ্বিধায়। শব্দ সাধারণত অশিক্ষিত মানুষরাই সৃষ্টি করে থাকে বলে আমরা জানি। কিন্তু শিক্ষিত মানুষরাও যে তাদের ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় শব্দ যোজন ঘটান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই অন্য ভাষার শব্দ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা নতুন শব্দ সংযোজন তো দূরের কথা, এমন কি আভিধানিক বহু শব্দকে বহিস্কার করতে তৎপর হয়ে উঠেছি। যার ফলে বহু শব্দ আজ অভিধানগত, শুধু অভিধানগত। ডায়াসপোরিক লেখকরা নাকি বাংলা ভাষাকে অচ্ছুত করছে– এমন চিন্তা পশ্চিমবঙ্গের প্রাতিষ্ঠানিক লেখকদের মস্তিস্কে ঝাকুনি দেয়; অলি গলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার বীজ হাইব্রিড করা হয়।

সবচেয়ে দুঃখের এবং পীড়াদায়ক বিষয় —— ডায়াসপোরিক বাঙালি এখন এই ভারতভূমিতে বলির পাঁঠা। ডায়াসপোরা হওয়ার ফলে বুঝতে পারছি অসমের বাঙালিদের করুণ অবস্থা। ১৯৬১ তে নিজের মাতৃভাষাকে পর্যন্ত হারাতে বসেছিল বাঙালি। তারজন্য বারবার প্রাণ হারাতে হয়েছে মাতৃভাষা রক্ষাকল্পে শিলচর এবং করিমগঞ্জের বাঙালিদেরকে। 'বঙাল খেদা' আন্দোলনের বলি হতে হয়েছে অসমের বাঙালিদেরকে। 'বঙাল খেদা' আন্দোলনে বাঙালির ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, নারীর শ্লীলতা হানি হয়েছে, মানুষ হত্য করা হয়েছে। বর্তমান অসমের বাঙালিরা চাকরি থেকে বঞ্চিত, ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে তাদেরকে মোস্তান কর আদায় দিতে হয়। ডায়াসপোরা এই প্রাবন্ধিকের পৈত্রিক বাড়ি (মোড়াবস্তি, লামডিং) ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বহিরাগত আখ্যা দিয়ে। মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, বিহার, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি সমস্ত রাজ্যের বাঙালিদের একই অবস্থা। ইফতিকার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের ফলে বাঙালিদের যেমন দুর্দশা হয়েছিল, তাই যেন আবার এই ডায়াসপোরিক বাঙালিদের দুর্দশায় পরিণত হতে চলেছে।

সমস্ত পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান সপ্তম এবং পৃথিবীর ছাব্বিশ কোটি মানুষের নাড়ির ভাষা বাংলা। আসলে বাঙালি লাথি খাওয়া স্বভাবের জাত। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে তাঁর 'দুরন্ত আশা' কবিতায় বাঙালি জাতি সম্বন্ধে বলেছেন, ''ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, / পোষমানা এ প্রাণ / বোতাম–আঁটা জামার নীচে / শান্তিতে শয়ান।'' ডায়াসপোরা বাঙালিরা সব সময়ই আতঙ্কিত।

একটা কথা সত্য যে, প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠি লেখকরা সামনাসামনি বা প্রকাশ্যে ডায়াসপোরা চিন্তাচেতনাকে সহ্য করতে না পারলেও অন্তরে অন্তরে একটা সাড়া, একটা পবির্তন অনুভব করেন অবশ্যই। তাই গোপনে অধুনান্তিক সমস্ত লেখাই আত্মসাৎ করতে যত্নবান হন। নব্য পৃথিবীতে বর্তমান একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাহিত্যের আভিনায়; সে পরিবর্তন পোস্টমডার্ন। আজ বাঙালিরা বাঙালিদের কাছে অবাঙালি। পশ্চিবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশে যে বাঙালিরা বাস করেন তারা ভিনরাজ্যের বাঙালিদের দুঃখের বারোমাসী শুনলেও, শোনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে ডায়াসপোরা এবং ডায়াসপোরিক লেখকদেরকে নিজের অধিকার সাব্যস্ত করতে হবে।■

''সাধারণভাবে পুরুষের চেয়ে নারীর সংসারের প্রতি আসক্তি বেশি। পুরুষের জীবনে কর্মকাণ্ডের জটিলতা ও অধিকার বোধের ব্যাপকতা যত, নারীর জীবনে তত নয়। নারীর প্রবণতা সংকোচনের দিকে, পুরুষের প্রবণতা প্রসারের দিকে। নারী অল্পেই সন্তুষ্ট, পুরুষ অল্পে সন্তুষ্ট নয়। তাই জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ঘটনা–প্রবাহে পুরুষের চেয়ে নারীর নিরাশ্রয়তা ও নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা কম।''

—— জীবেন্দ্র সিংহ রায়।

বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ সিক্বেন্স এবং ক্লাস্টার

ড. পাওলস ভি ডি,
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

[এই নিবন্ধের লেখক কেরলের অধিবাসী। শিক্ষা কেরলেই। বাংলা ভাষা তথা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেন নি এমন কি বাংলায় সঠিকভাবে লিখতেও পারেন না। তাঁর লেখাটি তৈরী করেছেন বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষের কথা শুনে, বিশেষ করে বদরপুর এন সি কলেজের ছাত্র–ছাত্রী ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে। যেহেতু লেখক উক্ত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক।]

মানুষ সাধারণত মনে করে যে, সংযুক্ত বর্ণই সংযুক্ত বঞ্জন ধ্বনির সৃষ্টি করে, কিন্তু তা নয়। আত্মা, হৃদয়, স্বামী ইত্যাদি শব্দের মধ্যে সংযুক্ত অক্ষর আছে কিন্তু এইসব শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন–ধ্বনি নেই, কারণ এইসব শব্দের সংযুক্ত বর্ণের একটি উহ্য থাকে আবার সংযুক্ত বর্ণ ছাড়াও সংযুক্ত ধ্বনির সৃষ্টি হয় যেমন 'করল' 'চশমা' ইত্যাদি শব্দে। তাই বলা যায়, সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি নির্ভর করে শব্দের উচ্চারণের উপর, শব্দের বর্ণের উপর নয়। এই লেখায় দুই ধরনের সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি (Sequence ও Cluster) এবং এদের দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দে দুই অথবা অধিক ব্যঞ্জন শব্দের পাশাপাশি উপস্থিতিকে Sequence বলে। তাই আমরা দেখি 'কর্ম', 'চশমা' 'করল' 'প্রধান' ইত্যাদি শব্দে Sequence আছে। এইসব শব্দে দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনি পাশাপাশি রয়েছে। আবার 'আত্মা', 'হৃদয়' 'স্মরণ', 'স্বামী' ইত্যাদি শব্দে Sequence নেই, কারণ একটি ব্যঞ্জন বর্ণ এখানে অনুচ্চারিত রয়েছে।

Cluster এর একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। একই Syllable এ স্বরবর্ণের আগে বা পরে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনির পাশাপাশি উপস্থিতিকে Cluster বলে। আবার পর পর থাকা ব্যঞ্জন ধ্বনিকে Sequence বলে। তাই বলে Sequence আর Cluster সমার্থক নয়। প্রত্যেকটি Cluster ই Sequence কিন্তু প্রত্যেকটি Sequence Cluster নয়। Sequence এ পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে। কিন্তু Cluster এ এই Sequence একই Syllable এ থাকতে হবে। দুটি কারণে Cluster শব্দটিকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত ভারতীয় ভাষাগুলোর বানান বিধি মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করেছে। প্রায়ই দুই বা তিনটি Sequence এর প্রকরণ একত্রিত করা হয়েছে এবং একটি প্রতীক হিসাবে লেখা হয়েছে অথবা একটা প্রকরণকে অন্যটির উপরে বা নীচে ব্যবহার করা হয়েছে। 'কষ্ট' শব্দে 'ষ' আর 'ট' কে যুক্ত করা হয়েছে। 'কর্তা' শব্দে 'র' প্রতীক কে 'ত' র উপরে ব্যবহার করা হয়েছে এবং মানুষ এগুলোকে Cluster মনে করে। আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে Syllable এর সীমা নির্ধারণ করার সমস্যা।

এটা বোঝার জন্য Syllable এর গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। শব্দকে ভাগ করলে যে অংশ গুলো হয় যার মধ্যে একটি স্বরধ্বনি ও সাধারণত এক বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনির উপস্থিতি থাকে, তাকে Syllable বলা যায়। অনেকসময় একটি শব্দে যতটি স্বরধ্বনি থাকে, ততোটি Syllable থাকে। 'কলম' (ক্+অ+ল্+অ+ম্) শব্দে দুইটি স্বরধ্বনি আছে তাই এতে দুইটি Syllable আছে (ক এবং লম)। 'রাষ্ট্রপতি' শব্দে চারটি স্বরধ্বনি আছে তাই এতে চারটি Syllable আছে। একটি Syllable এর তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার স্বরধ্বনি। এটাকে নিউক্লিয়াস (nucleus) বলে। একটি নিডক্লিয়াস নিয়েও একটি Syllable হতে পারে, যেমন 'এ' শব্দে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বরধ্বনির আগে বা পরে ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দুই দিকেই ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে। এই গুলোকে Syllableএর প্রান্তিক প্রকরণ (marginal elements) বলে। Syllablee এর গঠনকে দেখানোর জন্য আমরা Syllable কে 'onset' ও 'rhyme' এ ভাগ করতে পারি। Syllable এর যে অংশটা nucleus এর আগে আসে তাকে 'onset' বলে। নিউক্লিয়াস (nucleus) এবং তার পরে যদি ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে তাদের মিলিত অংশকে rhyme বলে। আর স্বরধ্বনির পরে আসা ব্যঞ্জন ধ্বনিকে 'coda' বলে। 'আত্মা' 'কর্ম' ও 'প্রমাণ' শব্দগুলোকে নীচে বিশ্লেষণ করা হলো ——

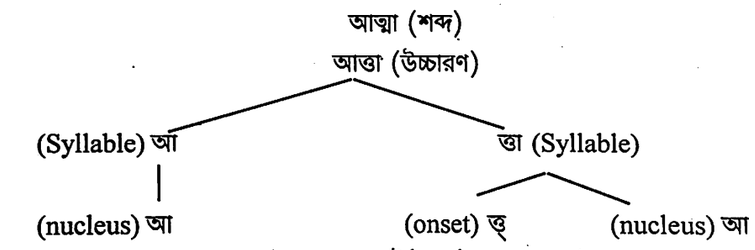

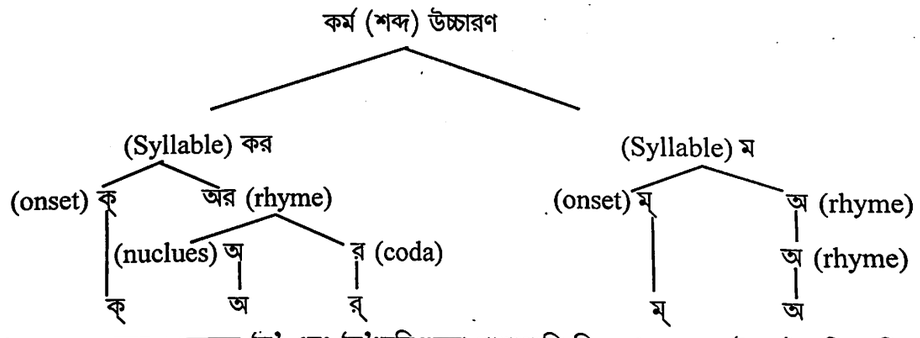

এই শব্দে Sequence আছে যেহেতু 'র' এবং 'ম'ধ্বনিগুলো পাশাপাশি কিন্তু cluster নেই তাই দুটি ধ্বনি দুটি Syllable এর অন্তর্গত।

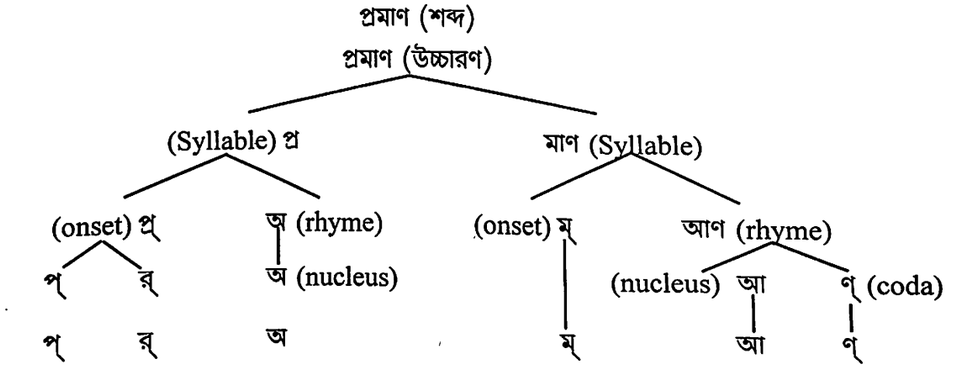

এই শব্দে Sequence আছে আবার একই সংগে এটা Cluster কারণ দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি 'প' এবং 'র' একই Syllable এর পাশাপাশি অবস্থিত।

ব্যঞ্জন ধ্বনি বা ব্যঞ্জন Cluster onset বা coda র জায়গায় বসে। একটা Sequence কে Cluster হতে হলে Sequence এর প্রতিটি সদস্যকে একই Syllable এর অন্তর্গত হতে হবে। তার মানে তারা একই onset বা coda 'র অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। একটি Cluster কখনই প্রথম Syllable এর coda এবং দ্বিতীয় Syllable এর onset এ বিস্তৃত থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন বর্ণের শুধুমাত্র অবস্থিতি একটি Cluster সৃষ্টি করে না। এটা কথ্য রীতিতে বা উচ্চারণে থাকতে হবে।

উপরের আলোচনা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, 'স্মরণ' 'স্বামী' 'হৃদয়' ইত্যাদি শব্দে Cluster বা Sequence কোনটাই

উপস্থিতি নয়। কারণ এদের যুক্তবর্ণের একটি অনুচ্চারিত থেকে যায়। কিন্তু 'কর্ম' শব্দটি অন্যরকম। এই শব্দে 'র' ও 'ম' দুটোই উচ্চারিত। দুটোই পাশাপাশি অবস্থিত। তথাপি এ শব্দে Cluster নেই। কারণ দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থিতি একই Syllable এ হতে হবে। এখানে দুই ব্যঞ্জন ধ্বনি দুইটি পৃথক Syllable এ রয়েছে।

এটা জানা প্রয়োজন যে, 'কর্ম' শব্দটিকে 'ক' এবং 'র্ম' এর পরিবর্তে 'কর' এবং 'ম' হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। স্বরধ্বনিকে দুইদিকে রেখে 'কর্ম' শব্দটিকে ভাগ করলে তাকে দুই প্রকারে ভাগ করতে পারি — 'ক' + 'র্ম' এবং 'কর'+ 'ম'। যদি আমরা প্রথমটাকে ধরে নিই তবে 'র' আর 'ম' একই Syllable এ থাকে আর আমরা যদি দ্বিতীয়টাকে নিই তবে 'র' আর 'ম' দুই Syllable এ পড়ে যায়। প্রথমটাতে একটা সমস্যা রয়েছে। এখানে 'র' আর 'ম' দুটোই দ্বিতীয় Syllable এর onset এ থাকে। 'র্ম' এটা কোন বাংলা শব্দের শুরুতে স্বীকৃত নয়। অন্য কথায় বাংলা ভাষায় কোন শব্দ 'র্ম' দিয়ে শুরু হয় না। দ্বিতীয়টিতে কোন সমস্যা নেই। এখানে 'র' প্রথম Syllable এর coda এবং 'ম' দ্বিতীয় Syllable এর Onset। বাংলায় 'কর' 'পর' ইত্যাদি শব্দ আছে যেগুলো 'র' দিয়ে শেষ হয়। আবার 'মোহন' 'মানুষ' ইত্যাদি শব্দ আছে যেগুলো 'ম' দিয়ে শুরু হয়। তাই দ্বিতীয় বিভাজন কর+ ম ই শুদ্ধ বিভাজন। এতে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে সহজ সরল হয় যে, কর্ম শব্দে কোন Cluster নেই।

আবার বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে যেখানে Cluster এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'প্রধান', 'প্রমাণ' 'শ্লোক', 'ক্রোধ', 'ক্রিয়া' 'স্তম্ভ', প্লাবন, ক্লেশ, গ্রহ, ত্রাণ, ত্রিশ, দ্রব্য, ব্রত, ভ্রমণ, ম্লান, শ্রমিক, স্ত্রী, স্পর্শ, স্নেহ, স্ফটিক, স্খলন, স্পৃহা ইত্যাদি শব্দে Cluster আছে। এটা লক্ষণীয় যে, ব্যঞ্জন ধ্বনি Cluster এর onset বা coda তে তাদের স্থান নেয় একটা অনুশাসন অনুযায়ী। যতবেশি শ্রুতি মাধুর্য থাকবে ততই তা স্বরবর্ণের নিকটে থাকবে। আমরা যদি 'শ্রমিক' শব্দটিকে দেখি 'শ' ও 'র' দুটো একই Cluster এর দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি। এখানে 'র' 'শ' থেকে বেশি সুরেলা তাই 'র' 'শ' থেকে স্বরবর্ণের বেশি কাছাকাছি। একইভাবে 'প্লাবন' শব্দে 'প' আর 'ল' দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি একই Cluster এ। এখানে 'ল' 'প' থেকে বেশি সুরেলা তাই 'ল' 'প' থেকে স্বরধ্বনির বেশি কাছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'স' ধ্বনির মধ্যে একটা ব্যতিক্রম আছে। 'স্ত্রী' শব্দে যদিও 'স' 'ত' থেকে বেশি শ্রুতিমধুর তবুও স্বরবর্ণ থেকে দূরত্বের হিসেব করলে 'স' বেশি দূরে।

বাংলা ভাষার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনেক সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ভাষা থেকে লোপ পাচ্ছে। পরিবর্তন যেকোন জীবন্ত ভাষার বৈশিষ্ট্য। যতবেশি পরিবর্তন হয়, ভাষা ততবেশি প্রাণ-স্পন্দিত বলে ধরে নিতে হয়। এবং এই পরিবর্তনের জন্য বাংলাকে একটা জীবন্ত ভাষা বলা যায়। এই পরিবর্তন একটা ধ্বনি যোগ করে দেওয়াও হতে পারে যেমন 'এ' 'গ' এর সঙ্গে যোগ করে গ্লাস কে গেলাস করা হয়েছে। কোন সময় আবার ধ্বনি বিয়োজিত হচ্ছে যেমন মধু থেকে 'ধ' ধ্বনি সরিয়ে তাকে মউ করা হচ্ছে। আত্মা শব্দে 'ম' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় না। এক ধ্বনির জায়গার জন্য ধ্বনিকেও আনা হয় যেমন 'বিলাতি' শব্দে 'আ' ধ্বনির পরিবর্তে 'ই' এনে 'বিলিতি' হচ্ছে। কোন কোন সময় ধ্বনির মধ্যে আন্তঃ পরিবর্তনও করা হয়, যেমন পিশাচ > পিচাশ, রিক্সা > রিস্কা ইত্যাদি।

এই লেখাতে কিন্তু উদাহরণ দেওয়া হল যেখানে Sequence বা Cluster থাকছে না, কারণ যুক্তাক্ষরের একটি অক্ষর অনুচ্চারিত থাকছে। 'আত্মা', 'মহাত্মা', 'পদ্ম', 'স্মরণ', 'স্মৃতি' ইত্যাদিতে 'ম', আহ্লাদ, সায়াহ্ন ইত্যাদিতে 'হ', 'স্বামী' 'স্বাগতম' ইত্যাদিতে 'ব', জ্ঞান ও অজ্ঞান শব্দে 'জ' এবং 'ঞ' এর পরিবর্তে 'গ' ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে তাই এসব ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরগুলি সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি নয়।

এতে দেখা যাচ্ছে অন্য ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলা ভাষার Cluster ও Sequence অনেক দ্রুত লোপ পাচ্ছে। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে উচ্চারণের সুবিধা।■

(অনুবাদ ঃ সুব্রত পুরকায়স্থ এবং জালাল উদ্দিন লস্কর)

তথ্যের অধিকার ঃ একটি সাংবিধানিক স্বাধীনতা

শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী,
গ্রন্থাগারিক

যে কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই এখন যথেষ্ট অবহিত। এই কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তথ্যের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গণতন্ত্রের মূল সুরটিও একই তারে বাঁধা। কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত মানুষই যে কোনো দেশের গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

ভারতবর্ষে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন প্রথম শুরু করেন রাজস্থানের সাধারণ মানুষ। রাজস্থানের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ এবং ওই সব প্রকল্পের সমাপ্তির মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য থাকায় সর্বসাধারণের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরার জন্য সেখানকার জনগণ তাঁদের তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা হলেন NCPRI (National Campaign for the People's Right to Information) এর সদস্যরা। ভারতবর্ষে অধিকার সংক্রান্ত প্রচারের দশম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রচারের ফলে কিছু উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের নয়টি রাজ্যে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। সেই রাজ্যগুলি হল —তামিলনাড়ু, গোয়া, রাজস্থান, কর্ণাটক, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং জম্মু ও কাশ্মীর। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০২ সালের ডিসেম্বরে সংসদে অনুমোদিত হয় এবং ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়। ২০০৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর ইউ.পি.এ. সরকার সংসদে নতুন আকারে তথ্যের অধিকার বিল (২০০৪) পেশ করেন। নতুন বিল সংসদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচিত হয়। তারপর ২০০৫ সালে ৪ মে মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। ২০০৫ সালের ১১ মে লোকসভায় পেশ করা হয় এবং অনুমোদিত হয়।

তথ্যের অধিকার আমাদের সংবিধানের অন্তর্গত একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটি আমাদের সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারাঃ স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত। ১৯(১)(ক) ধারা ঃ দেশের সমস্ত জনসাধারণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে। যদিও একথা সত্য যে সংবিধানের ১৯নং ধারায় তথ্যের অধিকারের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই, তথাপি আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট তার বিভিন্ন সময়ের রায়ে একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে যে তথ্যের অধিকার স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের মধ্যেই নিহিত।

এই আইনের 1. Preliminary, 2 (f) তে তথ্য বলতে বোঝানো হয়েছে "Any information in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force" এখানে record এর মধ্যে ধরা হয়েছে records (i) any document, manuscript, and file (ii) any microfilm, microfiche, and fasimile copy of a document, iii) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); any other material produced by a computer or any other device 2 (i) তথ্য এবং নথির প্রকারভেদে এই সংজ্ঞা দুটি একটি বড় প্রেক্ষাপটকে আইনের মধ্যে সামিল করতে সমর্থ হলেও, এই আইন কিন্তু মূলত সরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা এই আইনের একটি সীমাবদ্ধতার দিক।

তথ্য পেতে গেলে যে কোনো নাগরিককে লিখিত আবেদন করতে হবে এবং এ বিষয়ে তিনি কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে আইনে কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যস্তরের "Public Information Officer" কে "all reasonable assistance" দিতে বলা হয়েছে। তথ্যের জন্য যে কোনো ধরনের অনুরোধ যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা যেন কোনো অবস্থাতেই ৩০ দিনের বেশি না হয়। আইনের মধ্যে পড়ে এমন যে কোনো ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরের Public Information Officer এর কর্তব্য হল ওই ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যানের কারণ এবং কতদিনের মধ্যে

এবং কার কাছে তিনি এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন তা জানান।

তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন বিষয়ে জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য সমস্ত সরকারী সংস্থাকে তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য আধিকরিকরা জনসাধারণের তথ্য জানার অনুরোধগুলিকে যাচাই করবেন এবং ব্যতিক্রমের আওতায় না পড়লে তা তাদের সরবরাহ করবেন। এবং যাঁরা আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করবেন তাদেরও সুরক্ষা প্রদান করতে এই আইন তৎপর।

E-Governance এবং তথ্যের স্বাধীনতা, সঠিক সময়ে, সঠিক তথ্য, সঠিক মানুষকে প্রদান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। Vijaya Raghavan এবং Nair এর মতে E-Governance is the application of ICTS to the processes of Government functioning to accomplish simple, accountable, speedy responsible and transparent government. E-Government is not merely computerising existing government information, it is, in fact, transforming the existing government. It is the ICT enabled route to achieve good governance. It integrates people, process, information and technology for meeting governance goals. E-Governance represents a journey from passive information giving to active citizen involvement.

আশা করা যায় যে Information Technology Action Plan এর সুপারিশসমূহ সঠিক এবং পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হলে তা দেশে E-Governance ব্যবস্থা চালুতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অবশ্য ইতিমধ্যেই এবিষয়ে বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অন্যান্য বেশকিছু রাজ্যের মত আমাদের এ রাজ্য আসামও E-Governance চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে।

কিছু সরকারী কতৃপক্ষকে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় নিরপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এই আইনের আওতার বাইরে। এই কয়েকটি সংস্থা হল ইনফরমেশন ব্যুরোর সেন্ট্রাল ইকনমিক ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট, নারকোটিক কন্ট্রোল, আভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার, আসাম রাইফেলস ইত্যাদি।

রাজ্যসরকারের অধীনস্থ কিছু সংস্থাকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই আইনের আওতার বাইরে থাকাটি কখনোই চূড়ান্ত নয় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ও দুর্নীতির অবসান সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে এই সংস্থাগুলি বাধ্য থাকবে।

এ তো গেল আইন সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার। তত্ত্ব এবং তথ্য কি বলে সেটাও তো একবার দেখে নেওয়া দরকার। একথা নিশ্চিত করে বলা চলে যে তথ্যের অধিকারকে আর পাঁচটা মানবাধিকারের সঙ্গে একসারিতে বসানো বোধহয় ঠিক হবে না। এর তাৎপর্য বুঝতে হলে পরিধিটাকে আরও একটু বাড়াতে হবে। প্রসঙ্গত কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যাক –

ঘটনা এক ঃ অ্যালিস থাকত ঝাড়খণ্ডের চাইবাসা নামের আদিবাসী গ্রামে। জঙ্গলে বুনো হাতির তলায় যখন তার স্বামী মারা গেল বনকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্য কিছু সাহায্য সে আশা করেছিল। দরকার ছিল সদর থানার এফ আই আর এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টের একটা কপি। স্থানীয় পুলিশ অফিসার সেই কপি দেয়নি তাকে।

ঘটনা দুই ঃ ভূপালের সেই ভয়ঙ্কর গ্যাস দুর্ঘটনা, ১৯৮৪। কোন বিষাক্ত গ্যাসে তাদের এমন অঘটন জানতেও পারেনি সেখানকার মানুষ। যখন জানা গেল সেটি ছিল মিথাইল-আইসো-সায়ানেট,ই কার্বাইডের কাছে তার অ্যান্টিডোটটি জানতে চাওয়া হয়েছিল বাণিজ্যিক গোপনীয়তার অজুহাতে সেটি দিতে অস্বীকার করে।

ঘটনা তিন ঃ এনরন। দাভোল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপারে বিরোধিতা বা অন্য কোনো মতামত দেওয়ার সামান্য সুযোগটুকুও পায়নি সাধারণ মানুষ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ, মোট ব্যয়, ব্যয়ের হিসাবের প্রভাবিত এলাকা এরকমই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য না জানলে এব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কোম্পানি এ সব কোনো তথ্যেরই সরকারীভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি দেয়নি, ফলে কেউই সঠিকভাবে তাদের মতামত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের (সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি) কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি।

ঘটনা চার ঃ দিল্লির গরিব এবং দৃষ্টিহীন দুই বোন মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করে সেকেণ্ডারি পাশ করার পর তাদের স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তারা দুজনেই শিক্ষকতা করবে। তাদের এবং পরিবারের কারোরই জানা ছিল না যে প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ৩ শতাংশ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। অজ্ঞতার কারণে তাদের স্বপ্ন সফল হয়নি।

উপরের সবকটি ঘটনাই যে সাধারণ যোগসূত্রে বাঁধা তা হল তথ্য অধিগত করার অভাব। সরকার এবং নাগরিকের মধ্যে তথ্যের স্বাভাবিক বিস্তারের বাধা শুধু যে ভারতীয় সংবিধানে উচ্চ গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী তাই নয়, হাজার হাজার গরিবের উন্নতির জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সরকারি নীতির ব্যর্থতার পরিচায়কও বটে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর সরকারি কাজকর্মে মানুষ অংশীদার হতে পারবে, যখন তারা সরকারি নানা খবরাখবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবে। সঠিক তথ্য জানার উপরেই নির্ভর করে একটি সরকারের সুশাসন, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং অংশীদায়িত্বের ভিত্তি।

মানুষের উন্নয়ন ও বিকাশের ধারা মানবাধিকারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই অধিকারের ভাবনা আরও বেশি করে দাবি করে প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ দিতে পারে কেবলমাত্র তথ্যের সুনিশ্চিত প্রাপ্তি। তথ্যের অধিকার হল এমন একটি অধিকার যা গঠন করে সুশাসন, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বাস্তবিক প্রয়োগ। সুশাসন কেবলমাত্র দক্ষ সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দিতে পারে না, তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে সার্বিক অংশগ্রহণ এবং সক্রিয় নাগরিক গোষ্ঠিই গণতন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি।

দুর্নীতি রোধে তথ্যের অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের প্রতিটি মানুষের জীবন প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সরকারি প্রভাব। একথা মেনে নিতে মানুষকে দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে কিছু না কিছু দুর্নীতির প্রভাব নিরুপায়ভাবে হজম করতে হয়। বেনিয়ম করলে কর্মচারিদের ব্যাখ্যা করার অনীহা, দুর্ব্যবহার, দালালচক্র, বিনাকারণে কাজে দেরি করা, নিয়মকানুন –এসবই এদেশের অধিকাংশ সরকারি অফিসের বর্তমান চিত্র। এই সমস্যার উত্তর খুঁজতে গেলে সমস্যার প্রকৃত কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে যা আমাদের দেশীয় পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। কারণগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল:- স্বচ্ছ দায়বদ্ধতার মত বিষয়গুলিকে পরিকল্পিতভাবে অস্বীকার করা, জটিল ও বিভ্রান্তিকর নিয়মকানুন ফিতের ফাঁসকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে দেওয়া এবং জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিটি বিভাগে অবিরত অনীহা।

সামগ্রীকভাবে দুর্নীতি এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার কমে যাওয়া এবং এই সংক্রান্ত আইন মানুষের নাগালে আসার ফল বহুবিধ। সরকার এবং নাগরিকের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয় সেগুলি হলঃ

১। সমস্ত সরকারি কাজের হিসাব, বিল, ভাউচার, মাষ্টার রোল (যেখানে দৈনিক মজুরিভিত্তিক হাজিরা এবং মজুরি প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ থাকে)।

২। স্বেচ্ছামূলক সরকারি প্রকল্পে কারা উপকৃত হবেন তা নির্ধারণের পদ্ধতি এবং তাদের যে আবেদনকারীর সংখ্যা এবং কতজন সেই সরকারি সুবিধা পেলেন তার হিসাব।

৩। হাসপাতল, সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান, এবং সংশোধনাগার ইত্যাদিতে জনপ্রতি খাদ্য সরবরাহের হিসাব। হাসপাতালগুলিতে বরাদ্দ এবং ক্রয় করা ঔষধ এবং অন্যান্য সামগ্রীর হিসাব নিকাশ।

৪। বিভিন্ন পারমিট প্রদান, লাইসেন্স, সরকারি বাড়ি প্রদান, গ্যাস, জল এবং বিদ্যুৎ সংযোজন, বিভিন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যা ও নির্বাচিত আবেদনকারীর সংখ্যা, নির্বাচনের ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।

৫। কর সংক্রান্ত, সিভিল ও ক্রিমিনাল ওয়ার্ক ডিসপোজেল–এর তথ্য।

৬। বনসৃজন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন জমির পরিমান, কি গাছ লাগান হল, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচের হিসাব নিকাশ ইত্যাদি।

৭। বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত এবং যোগদানকারী শিশুর সংখ্যা, কতজন বিভিন্ন বৃত্তি পাচ্ছেন তার হিসাব নিকাশ।

৮। বিভিন্ন সরকারি এবং সরকারাধীন সংস্থার চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগের নিয়ম বিজ্ঞাপনের কপি অথবা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে পাঠানো নথিভুক্তির হিসাব, প্রয়োজনীয় আবেদনকারীর সংখ্যা এবং নির্বাচিতদের সংখ্যার যথাযথ বিবরণ।

৯। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম পাঠাবার সবিস্তার পদ্ধতি, সম্ভাব্য নিয়োগকারী কর্তৃক দাখিল তথ্য, এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত নামের তালিকা এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়োগকারীর কাছে পাঠানো তালিকা।

১০। কলেজে ভর্তির যোগ্যতা এবং পদ্ধতি, যথাযথ তথ্যসহ এবং নির্বাচিতদের তালিকা।

১১। অপরাধ সংক্রান্ত মাসিক তথ্য।

১২। মহিলা আদিবাসী, দলিত, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উপর কৃত অপরাধ নথিভুক্তি ব্যবস্থাদির তথ্য, আঞ্চলিক দাঙ্গা এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যাদি।

১৩। পুলিশি হেফাজতে থাকা লোকের সংখ্যা, মেয়াদ এবং কারণ।

১৪। জেল হেফাজতে থাকা লোকের সংখ্যা, মেয়াদ বিচার বিষয়ক তথ্যাদি।

১৫। উৎপাদনকারী সংস্থার (কলকারখানার) পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি।

তথ্যের অধিকার আইন জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় যে কতখানি ফলপ্রসু নিম্নের কয়েকটি ইতিবৃত্ত থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের খরচ ঃ

শ্রী তথাগত রায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তথ্যের অধিকার আইন মাফিক এক আবেদন পেশ করেন। যেখানে শ্রী রায় জানতে চান যে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে কী পরিমান টাকা খরচ হয়েছে এই তথ্য যে খুব সহজেই আমরা পেতে পারি, সেকথা সত্যিই আমাদের অজানা ছিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের টাকা কীভাবে খরচ করবে তার ওপর নজর রাখতে, তথ্যের অধিকার আইন এখন আমাদের কাছে এক জবরদস্ত হাতিয়ার হিসেবে এসেছে। যেমন, ওই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকার জানায় যে, ১৯৮৭–২০০০ এ এই বাবদ খরচ হয়েছিল ১৮,২৫,৬০০ টাকা আর ২০০১–২০০৫ এ এই খরচ হয় ৪,৬০,৭২২ টাকা।

উত্তরপত্র দেখার অধিকার ঃ

আপনি কি একজন শিক্ষার্থী, আপনি ভালো পরীক্ষা দিয়ে আশাপ্রদ ফল পাননি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে চান। মুশকিল আসান করল রাজ্য তথ্য কমিশন। কমিশনের নির্দেশে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ছাত্রছাত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র দেখাতে বাধ্য। তবে শর্ত, পরীক্ষক ও অনুসন্ধানকারীর নাম গোপন রাখা হবে। এই লড়াইয়ের সূত্রপাত এম.বি.এ. এর ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র উৎসব দত্তের হাত ধরে। ভালো পরীক্ষা দিয়েও আশানুরূপ ফল না পেয়ে উৎসব উত্তরপত্র দেখার আবেদন জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই আবেদন খারিজ হলে উৎসব দ্বারস্থ হয় হাইকোর্টে। সেখানেও সুবিচার না পেয়ে সাহায্য নেয় কমিশনের। অবশেষে উত্তরপত্র দেখাতে বাধ্য হন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার। (দ্য টেলিগ্রাফ ১৭.০১.২০০৭)

প্রশ্ন ধরে ধরে নম্বর জানাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

পরীক্ষায় কোন প্রশ্নের উত্তরে কত নম্বর তিনি পেয়েছেন, কোনো ছাত্র বা ছাত্রী আবেদন করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা জানিয়ে দেবে। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের আওতায় উত্তরপত্র দেখানোর বিষয়টি পড়ে কিনা, তা নিয়ে মামলার শুনানির সময় হাইকোর্ট এই রায় দেয়।

আবেদনকারী প্রিতম রুজের আইনজীবী শতদল ভট্টাচার্য বলেন, নম্বর জানার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। কত নম্বর এবং কেন এই নম্বর। খাতা বা উত্তরপত্র না পেলে এই দ্বিতীয় তথ্যটি জানা সম্ভব নয়। তিনি বলেন গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা রক্ষার জন্যই এই আইন চালু হয়েছে। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দরজা জানালা খুলে না দিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাইছে। তৈরি হচ্ছে একটা অচলায়তন। তাঁর প্রশ্ন, খাতা দেখাতে বিশ্ববিদ্যালয় এত ভীত কেন কী কী দেখানো যাবে না, তথ্য আইনেই তা বলা আছে। কাজেই খাতা দেখানো

নিয়ে সমস্যার অবকাশই নেই। বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেউ যখন কোনো তথ্য জানতে চান, তার অর্থই হচ্ছে, তাঁর কোনো প্রয়োজন আছে। কাজেই কোনো ছাত্র পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর অসন্তুষ্ট হয়ে খাতা দেখতে চাইতেই পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় কেন খাতা দেখাতে রাজি নয়, তা জানতে চান তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী বলেন, খাতা দেখানোর ব্যবস্থা একবার চালু হলে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী খাতা দেখতে চাইবেন। লক্ষ লক্ষ খাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বাড়তি চাপ সামলানো সম্ভব নয়। বিচারপতি বলেন চাপ তৈরি হবে, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সমস্যা ঠিকই। তা বলে আইনের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় কি? (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭.০৩.২০০৯)

মজলুমকে ঘরের সঙ্গে আশ্বাসও ঃ

মজলুমের বয়স ৬০ বছর। পেশায় রিক্সাচালক। মজলুমের অর্থনৈতিক অবস্থা দরিদ্রসীমার নীচে। মাথার উপর একটু ছাদের জন্য মজলুম ইন্দিরা আবাস যোজনায় একটি ঘরের জন্য পঞ্চায়েতে আবেদন করে। সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা ও বার্ধক্য ভাতার জন্যও একটি করে আবেদন পত্র দিয়ে রাখে। নিরক্ষর মজলুমকে পঞ্চায়েত থেকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এরপর স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতায় মজলুম বিডি-র কাছে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী আবেদন রাখে। এর পরেপরেই বিডিও এই যোজনা থেকে ১৫,০০০ টাকা পঞ্চায়েতকে দিতে বাধ্য করেন এবং পরবর্তী টাকা শীঘ্রই দেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত জানায়।

তথ্যের অবাধ আদানপ্রদান এবং সহজলভ্যতাই যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজের সাফল্যলাভের মূল শর্ত। ঠিক এই জায়গাতেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। তথ্য সংগ্রহের সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করে এবং তথ্যকে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলে একমাত্র গ্রন্থাগারই এই সাফল্য এনে দিতে পারে। জনসাধারণের কাছে সহজ এবং অবাধে তথ্য পৌঁছে দিতে পারলে তা যে শুধু তাদের আত্মোন্নতির কাজে লাগবে তাই নয়, এর ফলে তারা সামাজিক উন্নতির সহায়ক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। গ্রন্থাগারের এই দায়িত্বের মূল শর্তই হল – তথ্য প্রকাশের বাহ্যিক মাধ্যমে তা সেই বই, ভিডিও ক্যাসেট, কমপ্যাক্টডিস্ক, ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেট যাই হোক না কেন, তা যেন সাধারণ মানুষের কাছে তথ্যের সহজলভ্যতার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

ভারতবর্ষের আগে আরো অনেক দেশ যেমন আমেরিকা, ইংল্যণ্ড, সুইডেন ইত্যাদি তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ করেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানেই তার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, যেটি হল এই অধিকারটি কিন্তু কিছু কিছু শর্ত তথা ব্যতিক্রম সাপেক্ষ। কারণ অধিকারের সঙ্গে মানুষের দায়িত্বের দিকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা অপরিমিত স্বাধীনতা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা করতে পারে। তথ্যের স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সর্বদা সমাজ তথা দেশের স্বার্থ বা হিতবিধান সবার আগে বিবেচনা করা উচিত।

সবশেষে বলা যায় যে, জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ব্যবহারের সুবিধা দিতে বিভিন্ন মহল থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বা উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে –

১। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে আরো বেশি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

২। গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত প্রকার তথ্যই সংরক্ষণ তথা ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা তা সে মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমেই উপলব্ধ হোক না কেন।

৩। সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগারের কাজকর্মগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করার ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগারগুলির নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর ফলে যেকোনো গ্রন্থাগারে রক্ষিত যে কোনো প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য, চাহিদা জানানো মাত্র যে কোনো ব্যবহারীর কাছে পৌঁছতে পারবে।

৪। সমস্ত প্রকার সরকারী, আধাসরকারী তথা বেসরকারী সংস্থার বর্তমান কাজকর্মের খতিয়ান সংক্রান্ত নথিপত্রও যাতে করে অতি সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় তা সুনিশ্চিত করা।■

Accn 57
NABIN CHANDRA COLLEGE LIBRARY BADARPUR KARIMGANJ

ক্ষুধা এবং ভারতবর্ষ

শ্রী সৌমিত্র চৌধুরী
প্রবক্তা, অর্থনীতি বিভাগ

''ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি''।

কবি সুকান্তের উক্ত পংক্তিগুলি বর্তমান ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে একটুও বেমানান নয়। ভারতবর্ষ এক ক্ষুধার সাধারণতন্ত্র।

সরকারী হিসেব মতে ভারতবর্ষে দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানে ২৫ শতাংশ। এই দরিদ্রসীমারেখা তৈরী করা হয়েছে দৈনিক খাদ্য ভক্ষণের হিসেবে। ভারতবর্ষে শহরে বসবাসকারী লোকেরা যদি দৈনিক ২১০০ কেলোরির নীচে খাদ্য ভক্ষণ করে এবং গ্রামের মানুষ যদি ২৪০০ কোলোরির নীচে ভক্ষণ করে তাহলে তারা দরিদ্রসীমা রেখার নীচে বসবাস করছে। টাকার হিসেবে বর্তমান মোটের ওপর ৬০০ টাকা আয়ের পরিবারকে দরিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবার বলে গণ্য করা হয়। ওই আয় কমিয়ে মাসিক ৬০০ টাকা আয়ের পরিবারকে ৪০০ টাকা করার উদ্যোগ চলছে।

ভারতবর্ষে দরিদ্রসীমারেখা তৈরি হচ্ছে শুধু খাদ্যের ভক্ষণ হিসেবে। কিন্তু যে কোনো মানুষের নিম্নতম চাহিদার মধ্যে কাপড়, বাসস্থান পানীয়জল ইত্যাদিও থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে খাদ্যের সঙ্গে এই নূন্যতম সুযোগ সুবিধাগুলো যদি জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ষের ৮০ শতাংশ মানুষই দরিদ্রসীমারেখার নীচে চলে আসবে।

স্বাধীনতার ৬১ বছর পর গ্রামীন ভারতে দরিদ্রের শোচনীয় চিত্র প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী ২০০৮ এ। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী এবং এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের যৌথ প্রতিবেদন জানাচ্ছে, অপুষ্টিতে ভোগা বিশ্বের ২৩ কোটি মানুষের বাস এই ভারতবর্ষ। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ।

ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স' (বিশ্ব ক্ষুধার্ত সূচক – ২০০৮) এর রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের সব থেকে বেশি ক্ষুধা-কাতর ৮৮টি দেশের সূচক ভারতের স্থান ৬৬ তম। ওই সূচকে দেখা যাচ্ছে ভারতের সব রাজ্যের ক্ষুধার সমস্যা রয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যার ১৭ শতাংশের বাস ভারতে, কিন্তু ওই ক্ষুধাকাতর মানুষের এক-তৃতীয়াংশই ভারতে।

রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের স্থান ১২৮ তম। গ্রামীণ ভারতের মোট শিশুর ৮০ শতাংশই অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত। ক্ষুধা-অভাবের তাড়নায় ভারতে গত এক দশকে আত্মহত্যা করেছেন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৩৬ কৃষক, মানুষের নূন্যতম প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিসেবা,বিশুদ্ধ পানীয় জল, বস্ত্র, বাসস্থানের সুযোগ এবং অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, ৭০ শতাংশ ভারতবাসী তা উপার্জন করতে পারে না। মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৯৯০-৯১-এ যেখানে ছিল ৪৬৮ গ্রাম, ২০০৫-০৬-এ তা কমে হয়েছে ৪১২ গ্রাম।

কেন্দ্রের ক্রেতা বিষয়ক খাদ্য এবং গণবণ্টন মন্ত্রকের তথ্য মতে রাজ্যগুলিতে দরিদ্র সীমার উপরে যাদের রেশন কার্ড রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বার্ষিক খাদ্যশস্যের পরিমাণ ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৭-২০০৮ সালের মধ্যে ৭৩.৩৬ শতাংশ ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন ধরনের রেশন কার্ড রয়েছে ভারতবর্ষে। কিন্তু হতদরিদ্রের কাছে পৌঁছায় না রেশনকার্ড, রেশন তো দূর অস্ত। একটি জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে, দরিদ্রতম পরিবারগুলির ৫১ শতাংশের কোনো রেশন কার্ড নেই।

একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে দরিদ্ররা ক্ষুধায় কাতর হচ্ছে আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ২০০৭-০৮ সালে মাত্র ১২ মাসের মধ্যে গম ও ভুট্টার দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। চালের দাম বেড়েছে তিন গুণ। ইতিহাসে খাদ্যশস্যের এমন অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির নজির অতীতে কোনদিন দেখা যায়নি।

বর্তমান ভারতবর্ষে ক্ষুধার এই দেশে একদিকে যেমন দরিদ্রের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে অন্যদিকে কিন্তু মুষ্টিমেয় মানুষের অবস্থা খুব ভালো হচ্ছে। সুইস ব্যাঙ্কের গোপন আমানত তালিকার শীর্ষে ভারতীয়রাই। সুইস ব্যাঙ্কিং অ্যাসোসিয়েশনের ২০০৬-এর রিপোর্টই দেখা যাচ্ছে সুইস ব্যাঙ্কের ভারতীয়দের আমানতের মোট পরিমাণ ৬০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। একদিকে কৃষক আত্মহত্যা করছে অন্যদিকে কালোবাজারীদের দাপট এবং অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন। শেয়ার বাজারে চলছে ফাটকা খেলা এবং ভুগতে হচ্ছে সাধারণ দরিদ্র মানুষদের। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশন বলছে, ভারতে ৮৩ শতাংশ মানুষ গড়ে মাথাপিছু দৈনিক ২০ টাকার বেশি ব্যয় করতে পারে না এবং অর্ধেক ভারতবাসীর মাথাপিছু দৈনিক ব্যয় করার ক্ষমতা ৯ টাকারও কম। ফোর্বসের মতে ২০১৭ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিলিয়নিয়ারের বাসভূমি হবে এই ভারতবর্ষ। একদিকে চলছে 'সাইনিং ইণ্ডিয়া' এবং অন্যদিকে চলছে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের 'সাফারিং ইণ্ডিয়া'। আশ্চর্য এই সহাবস্থান। ভবিষ্যতই বলবে এই সহাবস্থান স্থায়ী হবে কি না।■

মিথ ও পুরাণ

সুস্মিতা নাথ
প্রবক্তা, বাংলা বিভাগ

'মিথ' শব্দটিকে বাংলা অনুবাদে পুরাণ প্রতিভাস বলা হয়েছে। তবে মিথ কিন্তু পুরাণ নয়, পুরাণ লিখিত রূপ। মিথ তৈরি হয় মানুষের মনে এবং মুখে-মুখে তা চলে আসে। মিথের প্রবর্তন কবে কোথায় হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা না গেলেও খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ৭৫০০-৫০০ এ প্রবর্তন হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এই সময়টা প্রোটা নিত্তলিথিক যুগ নামে পরিচিত। এই সময় মানব সভ্যতা শিকার করে খাদ্য সংগ্রহের পর্যায় থেকে পশুপালনের স্তরে এসে গেছে এবং ধীরে ধীরে কৃষি সভ্যতার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় থেকে শক্তিশালী প্রাকৃতিক প্রকাশ যেমন- জল, আগুন, ব্রজ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিয়ে গল্প কথা শুরু হয়েছে। কৃষি সভ্যতার সময় থেকেই পূজা পার্বনের শুরু। এইসব পূজা পার্বনের অনুষ্ঠানের মূলে আছে যে মিথের অস্তিত্ব তা সকলেই স্বীকার করেছেন। মিথের সংজ্ঞা অনেকেই অনেকরকম দিয়েছেন। আমরা কয়েকটি এখানে তুলে ধরেছি।

(ক) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ''মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনী''।

(খ) জোসেফ ক্যাম্পবেল বলেছেন- "Myth is a large controlling image which gives philosophic meaning to the facts of ordinary life or symbol of the spiritual norm."

(গ) "Mythology would be held to be reflection of the social structure and of social relation."

(ঘ) "In myth are find again the tri-dimenisional pattern the signifier, the signified snd the sign".

মিথের সংজ্ঞা নানাভাবে সাজিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রায় সকলেই এঁরা এই কথা বলেছেন যে-এর মাধ্যমে একটি জাতি বা গোষ্ঠির ঐতিহ্যের প্রাচীনতম রূপটিকে অনুভব করা যায়। এর থেকেই আমরা জানতে পারি মিথ কীভাবে গড়ে উঠেছে আদিমকালে। আদিম মানব প্রাকৃতিক শক্তিকেই পূজা করত এবং এই শক্তির বিবর্তিত রূপই হল দেবতা। যাদের ক্রোধ নিরসন এবং মনস্তুষ্টির জন্য পালন করা হত নানা আচার এবং আচরণ। এরই জন্য যে সব গল্প রচিত হয়েছিল, তাই রূপান্তরিত হয়েছে মিথে। অনেক খণ্ড-খণ্ড ভাবনা কালক্রমে গ্রথিত হয়েই একটি বিশাল মিথ কথার জন্ম দিয়েছে।

'Myth' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক 'Muthos' শব্দ থেকে। যার অনুষঙ্গে বোঝা যায়, ব্যাপারটি ছিল মৌলিকভাবে প্রচলিত কাহিনি। যা আদিম কাল থেকে মানব সমাজে ক্রমবিবর্তিত রূপে চলে আসছে। মিথের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিব অস্তিতের হদিশ পাই। মিথের মধ্যেই একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামোটি নিবিড় ভাবে মিশে থাকে। উত্তরকালে তার উপরেই গড়ে ওঠে সাহিত্যের রাজপ্রসাদ। মিথের আদিম রূপটির মধ্যে ধর্মাচার, দেবতা পরিকল্পনা সেই উপকরণগুলিকে বয়ন বর্জন করেই নিজেদের সমসাময়িক জীবনধারার লব্ধফল যে সব ধ্যান-ধারণা তার সংগে মানান করেই নতুন নতুন কাহিনি সৃষ্টি করেন আমাদের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই রকম অনেক কাহিনি আছে। হরধনু ভেঙে রামচন্দ্রের সীতাকে লাভ করা, কিংবা অহল্যা শাপমুক্তি রামের স্পর্শে ইত্যাদিতে রয়েছে। শিকারজীবী অর্থনীতি থেকে কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণের এবং অকর্ষিত জমি কৃষির মাধ্যমে শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠার কাহিনি।

'পুরাণ' বলতে বোঝায়- ইতিহাস, আখ্যান, লোককথা, ধর্মআলোচনা, সমাজবিধি, দেবমাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক জিনিসকে সমন্বিত করে যে মিশ্ররূপ সম্পন্ন গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তাদেরকেই পুরাণ বলা হয়। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এ পাঁচটি লক্ষণ যে বইগুলিতে আছে, তাকেই পুরাণ বলা হয়। আদিম মিথ থেকে যেমন গ্রীক মিথলজি এবং আমাদের পুরাণ বৃত গড়ে উঠেছে, তেমনি আমাদের পৌরাণিক সংস্কৃতি কিছুটা আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেও উজ্জ্বল। আমাদের ধর্মধারা আমাদের মধ্যে পুরা কেন্দ্রিক সাহিত্যের দ্বিমাত্রিকতার সৃষ্টি করেছে। প্রতীচ্যের প্রাচীন মিথ তার ধর্ম ভাবনাকে লুপ্ত করে দিয়ে শুধু সৃষ্টির উপকর

হিসেবেই দেখেছে। আর আমাদের পুরাণ কথা মূলত 'রসায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর মধ্যে সংকলিত - তাতে সব সময় প্রতীচ্যের সহজ পরিবেশ ফুটে ওঠে না। যেমন 'মেঘনাদবধের' কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই আমাদের যা পুরাণ, তার মধ্যে মিথ ইতিহাস, কিংবদন্তী, লোককথা এমনভাবে মিশে রয়েছে যে বহুক্ষেত্রেই তাকে হয়ত পুরা মিথ বলা যায় না। তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। আসলে পুরাণকে এখনও আমরা বহুক্ষেত্রেই সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি বলে মনে করি। সেজন্য সীতার মত আনুগত্য, লক্ষণের মত ভ্রাতৃভক্তি, শকুনির মত ধূর্ততা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ইত্যাদি ভাবনা বিশিষ্ট ধরনের তাৎপর্য বহন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুরাণ নির্ভর যে সব কাহিনি আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে যে মানসিকতায় সেগুলি তৈরি, তার আদর্শ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, প্রতীচ্যের মিথ নির্ভর সেকুলার আধুনিক সাহিত্যই যে, সে কথা মানতেই হয়।

যদিও ভারতীয় ঐতিহ্যে পুরাণ কথাটির আলাদা কিছু ধর্মীয় তাৎপর্য আছে তবু আধুনিক কালে প্রধান দুটি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর বিভিন্ন পাঠে সংকলিত কাহিনি গুলিকেই পৌরাণিক গল্প বলে গণ্য করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী পুরাণ ও ইতিহাস সমার্থক। বহুকাল ধরেই 'মহাভারতে'-র কাহিনিগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার এর মধ্যে স্থান ও সামাজিক ঐতিহ্যানুসারে অনেক কিছু গ্রহণ-বর্জন করা হয়েছে। তবে মূলে দুটি মহাকাব্য এমনভাবে মানুষের অন্তরে শিকড়টি প্রবিষ্ট করেছে যে আধুনিককালের লোকেরাও এই দুটি মহাকাব্য-এর অন্তর্গত পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে নতুনভাবে রচনা করেছেন তাঁরাও সেই শিকড়ের বন্ধন অতিক্রম করতে পারেননি, আমরা যখন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু পড়ি তখন বুঝতে পারি তাঁরা তাঁদের লেখায় শিকড়কেই ধরতে চাইছেন। এটা শুধু বাঙালি লেখকদের বেলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের লেখকদের সম্পর্কেই সত্য।

''বোদলেয়ার এক সময় মন্তব্য করেছিলেন, একই সংগীত বিভিন্ন শ্রোতার মনে ভিন্নতর আবেদন ও মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে।'' তাছাড়া লেঙিস্ট্রাম বলেন, ''মিথ ভিন্ন-ভিন্ন কবির কাছে নানা কল্পনায় আবর্তিত হয়।'' এই কথাটি সত্য। বিভিন্ন সময়ে আমরা একই পুরাণ কাহিনি ও মিথ কাহিনি বিভিন্ন কবির কাছে ভিন্নতর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি, তবে প্রত্যেক কবিই শিকড়ের বন্ধনকে অতিক্রম করে অন্য কিছু ভাবা তা সম্ভব হয় না।

আমাদের প্রাচীনতম মহাকাব্য কৃষি অভিযানের বিজয় কথা। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থ নিয়েই 'রামায়ণ' বিচার করেছেন। সীতা অর্থে হল রেখা। তিনি ভূমিজাত এবং ভূমিতেই লীন। পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাস যখন 'রামায়ণ'কে নিলেন এখন তাঁর উদ্দেশ্য ভক্তিরস সৃজন। বীরত্ব কাহিনিও ভক্তি ভাবনায় আপ্লুত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম।

উনিশ শতকে মাইকেলের কাছে 'রামায়ণে'-এর আবার ঘটল নবরূপায়ণ। তিনি রামকে নয়, রাবণকেই বড় করে প্রচলিত কাঠামোয় ভেঙে দিতে চাইছেন। যদিও পুরো 'রামায়ণ' তিনি গ্রহণ করেননি। নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে ইয়ংবেঙ্গলের সব চিন্তাধারাই তো বৈপ্লবিক। তাই রাম নয়, রাবণকেই তিনি প্রধান করে তুলতে চেয়েছিলেন।■

''ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাব্যগত অভিজ্ঞতা যে এক নয়, প্রথম যেখানে সারা, সেখানেই দ্বিতীয়ের শুরু, এবং যে পর্যন্ত কবিতা রচনা না ফুরায়, সে পর্যন্ত শেষোক্তের বিকাশতো চলে বটেই, উপরন্তু কাব্যবিশেষের সমাধানেও তার উন্মুদ্রণ অনেক সময় থামে না।''

- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

নারী নির্যাতনের জন্য নারীরাই দায়ী

হাফিজা খাতুন
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে, নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি আন্দোলন, নারীর অধিকার নিয়ে চিন্তাচর্চা। বর্তমান যুগে নারীরা চায় মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে আকাশের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করতে। তারা কোনো বাধাই মানবেনা, অধিকার আদায়ে তাদের মন-প্রাণ চঞ্চল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে উঠে নিজের সত্তা তথা সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে যারা এই শ্লোগান দিচ্ছে যে, নারীর মর্যাদা চাই, চাই তাদের পুরুষের সম অধিকার। প্রশ্ন হচ্ছে – তাদের এই মর্যাদা ও অধিকারের হরণকারী কে? নারীরাই হল নারীজাতির মর্যাদা ও অধিকারের হরণকারী। আমরা কেউ এই কথা অস্বীকার করতে পারবনা যে বিশ্বমানব সমাজের অর্ধেক অংশ নারী। নারীগণ 'মা' জাতি। সহজকথায় পৃথিবীতে 'মা' ছাড়া মানবজাতির আগমন কল্পনাই করা যায় না। সেখানে কি করে মাতৃ জাতির মর্যাদা ভুল হয়। তাঁদেরকে যদি নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সমাজের উন্নতির অন্তরায় তো এখানেই। আমি আবার ফিরে আসছি নারীর অবদান প্রসঙ্গে। বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে মানবজাতির ইতিহাসে এ পৃথিবীর উন্নতিতে যতটা অগ্রগতি লাভ করেছে তার মূলে নারীর যে অবদান তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? না, পারবে না। যে নারী সমাজ পৃথিবীর উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়েছিল আজ সেই উন্নত পৃথিবী নারী সমাজকে পিছনে ফেলে দিয়েছে, পদে পদে নারীরা হচ্ছে অবহেলিত, কারণ বর্তমানে নারীরা ভুলে গেছেন আপন সত্তা তথা অস্তিত্ব।

আজকাল নারীরা নিজের নারীত্বের কদর বোঝে না। তারা মনে করে নারী হওয়ার জন্যই আমরা অবহেলিত লাঞ্ছিত। না, আসল ব্যাপার হল পৃথিবীর কোনও ধর্মই নারীকে অবহেলা করেনা বরং সম্মান করে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে নারীর এই অবমূল্যায়নের প্রধান কারণ নারীরাই। নারীরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে সঠিক রূপে মূল্যায়ন না করতে পারে তবে কি কামুক পুরুষরা করবে নারীর মূল্যায়ন ?

আজ যে সমস্ত নারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মানদণ্ডে ভারতীয় নারী প্রগতির আন্দোলন করতে চান, তাদের জানা দরকার ইউরোপিয় সভ্যতায় যা স্বাভাবিক ও লোকাচার বলে পরিগণিত হয়, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তাকে অতি জঘন্য মনে করা হয়। যে সকল নারী, নারী স্বাধীনতার নাম নিয়ে সমাজে হৈ চৈ শুরু করেছেন তারা কীভাবে তাদের পুত্রবধূর স্বাধীনতা হরণ করে শোষকরূপী নিজের ছেলের হাতে তুলে দেন। হ্যাঁ, পত্র পত্রিকাতেও যেসব বধূ হত্যা বা বধূ নিগ্রহের ঘটনা পাওয়া যায় সেগুলির প্রকৃত খোঁজ নিলে বেরিয়ে আসবে যে, এর পেছনেও বা ননদ রূপী আরেক মহিলার মুখ্য ভূমিকা। যৌতুক ইত্যাদির ব্যাপারেও স্বামী বা শ্বশুরের চেয়ে শাশুড়ির আকাঙ্ক্ষা বেশির থাকে। তা থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, নারীরাই নারী নির্যাতনের কারণ তথা প্রগতির অন্তরায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্ধ-উলঙ্গ নারী চরিত্র আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশাধিকার পাওয়া নারী লাঞ্ছনার অন্যতম কারণ। আর সেই অর্ধ-উলঙ্গ চরিত্রকে আমাদের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার অধিকার তো কোনো পুরুষ দেয়নি, সেই অধিকার তো দিয়েছেন নারীরাই। কারণ তারা যদি সেই অর্ধ-উলঙ্গ বস্ত্রব্যবহার এড়িয়ে চলতেন এবং তাদের সংস্কৃতিগত পোশাক পরিধান করতেন তাহলে ভারতবর্ষে নারী নির্যাতন অনেকটা কম হত। কিন্তু কোথায়, তারা তো সেই বাহারী পোশাক পরিধান করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন।

নারীরা যে নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী তার প্রমাণ দিতে গিয়ে আমি দুইজন বিখ্যাত নারীর বক্তব্য তুলে ধরছি। প্রথমে বলছি- ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সাড়া জাগানো অভিনেত্রী বিপাশা বসুর কথা, তিনি নিজের মুখে বলেছেন আমার দেহের সৌন্দর্য যদি পুরুষরা না দেখে তা হলে তো সেই সৌন্দর্যের মানেই হয় না। আর বলছি বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের কথা, তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে বলেছেন, আমার দেহ আমি যাকে ইচ্ছে করব যখন ইচ্ছা করব দান করব। এর থেকে আমি মনে করি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে নারী নির্যাতনের জন্য কারা দায়ী? কারণ যে নারী জাতি প্রকৃতি গত ভাবেই কিছু গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। তারা যখন সেই গণ্ডি লংঘন করে বেরিয়ে আসবে তখন তো লাঞ্ছিত হবেই আর এই লাঞ্ছনার দায় সম্পূর্ণরূপে নারী সমাজের ওপরই বর্তাবে।

বর্তমান সভ্যতার যুগে অনেক নারী এমন আছেন স্বামী গৃহে গিয়ে স্বামীর বৃদ্ধ মাতা বা পিতাকে দেখে কপাল কুঁচকান। এ-রকম নারীরা যখন স্বামী কতৃক নিগৃহীত হবেন তখন দোষটা কার ওপর চাপানো দরকার? আপনারাই বিবেচনা করবেন।

আইন প্রণয়ণ করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নারীরা নিজেদেরকে সঠিক মূল্যায়ন করবে এবং তাদের আদর্শ পথ বেছে নেবে।■

মানবিকতা

খাদিজা সুলতানা
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

দিন-মাস এবং বছর নিয়েই চলমান বিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছে, তেমনি এর যাত্রা বিরতিও ঘটবে দিন, মাস, কিংবা বছরের যে কোন প্রান্তে। এ চলার প্রথম পদক্ষেপ দিন, দ্বিতীয় পদক্ষেপ মাস এবং তৃতীয় পদক্ষেপ বছর। জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দিন ও রাতের সময়কে ঘণ্টা, দণ্ড, পল ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া দিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে রাত্রি। দিনের আবর্তনের সাথে সাথেই রাত ও আবর্তিত হচ্ছে। দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন আগমন ও নির্গমনের এ খেলা করে থেকে শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ তা মানুষেরঅজানা।

মানুষ সীমিত সময়ের জন্য পৃথিবীতে আগমন করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পর মৃত্যুর কোলে টলে পড়ে। এই পৃথিবী মানুষের জন্য আসা যাওয়ার এক বিরাট পান্থশালা স্বরূপ। এখানে চিরস্থায়ীভাবে কেউ কোনদিন থাকেনি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

কিন্তু এই পান্থশালায় মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে কাজ করতে হবে। কাজের মাধ্যমেই তার যথার্থ মর্যাদা প্রতিফলিত হবে। তাই কাজে সফলতা লাভ করার জন্য আমাদের – শক্তি, সাহস পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন। আঘাত সংঘাতের মাঝে যে অটল থাকতে পারে – এ বিশ্বে তারই বাঁচার অধিকার আছে।

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে অর্থনৈতিক বিভেদ প্রবল মানুষ একান্ত ভাবে আত্মাকেন্দ্রিক ও লোভাতুর হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। অন্যকে অবহেলা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে আমরা পেছনেই পড়ে থাকব। তাই কবিরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— ''যারে তুমি নাচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।''■

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্প

পর্ণা পুরকায়স্থ
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সাধারণত কবি, সাহিত্যিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার বিভিন্ন রূপে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আরেকটি দিক হল তিনি চিত্রশিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের ছবির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হল রেখার খেলা। লেখক হিসেবে নিজের কলমকে তিনি কেবল শব্দ লেখার জন্যেই ব্যবহার করেন নি, কলমকে তিনি শব্দ রচনার বাইরে নিয়ে এসে কিছু গতিময়তা সৃষ্টি করলেন এবং অবাস্তব জগৎ থেকে তাঁর নিজের অর্ধচেতনার সহায়তায় নতুন রূপের দর্শনে বাস্তব জগৎকে ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তব তাঁর ছবি অর্মূত- প্রধান ছবি। একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য প্রেমের সম্পর্ক। যদিও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন আর ছবির মধ্যে যা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, তবুও সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ আর চিত্রকলার রবীন্দ্রনাথ দুজন আলাদা মানুষ, একথা ভাবা সঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে, ছবি আঁকার অধ্যায় তাঁর জীবনী গ্রন্থের উপসংহার। তাঁর ছবি ও তাঁর আত্মজীবনী যার একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত। ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি তাঁর কবি জীবনকে আর একবার নতুন করে উপলব্ধি করলেন এবং এই উপলব্ধির ফলে তাঁর সাহিত্য-রচনার ভঙ্গি বদলে গেল এবং পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে। তবে একথা মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর ছবি আঁকার অভ্যাস বজায় রাখতেন তবে হয়তো ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁর ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ বা নন্দলাল যাঁরা ভারতীয় চিত্রকলার পথিকৃৎ তাঁদের সঙ্গেই স্থান পেতেন। অবশ্য ভারতীয় শিল্পজগতের নবজাগরণের পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যথেষ্ঠ সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে শিল্পকলা ছিল শেষ ও শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যা বিশ শতকের চিত্রজগতের এক বৈপ্লবিক ঘটনা।■

মিথ্যা কথা না বলে যাই কোথায়

সবিতা রায়
স্নাতক প্রথম বর্ষ

''সদা সত্য কথা বলিবে'' তা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি এবং বাবা-মাও এই শিক্ষাই দিতে চান এবং দিয়ে এসেছেন ও। কিন্তু আমরা কী এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি বা পারলেও কতটুকু?

মিথ্যা কথা বলা পাপ সবাই জানি এবং জানে। বলা যতটা সহজ পালন করাটা ততটাই কঠিন। এই কথাটা বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পারে তরুণ-তরুণীরা। উদাহরণ স্বরূপ বলতে গিয়ে আমি আমার এক বান্ধবীর কথাই বলি— সে কলেজে গিয়েছিল, ঘরে আসতে একটু দেরি হল কারণ সে বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে একটু গল্পে মেতেছিল। ঘরে আসার পর ওর মা ওকে জিজ্ঞেস করলেন-- তোর ঘরে আসতে দেরি হল কেন? তখন সে বলে উঠল একটা জরুরি ক্লাস ছিল তাই দেরি হয়ে গেল। তাতে বাবা-মা দুজনই সন্তুষ্ট এবং সেও কতগুলো বাণী শোনা থেকে বেঁচে গেল। এখন যদি সে সত্য কথাটি বলে দিত তাহলে তার বদলে শুনতে হত এক গাদা জ্ঞানের কথা। আর তা কিশোর-কিশোরীরা শুনতে মোটেই রাজী নয়।

আসলে দোষ কারোরই নয়, কারণ মা-বাবাদের এবং ছেলে-মেয়েদের চিন্তা-ভাবনা, উচিত অনুচিতের মধ্যে থাকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আর তার ফলেই দিনে হাজারটা মিথ্যা কথা না বলতে চাইলে বলতে হয়। বাবা-মা রা চিন্তা করেন আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের, আর আমরা চিন্তা করি শুধু বর্তমানের। এভাবেই এই সব মিথ্যা কথাই হয়ে ওঠে তরুণ-তরুণীদের জন্য কাল এরা চালিত হয় ধ্বংসের পথে।

সবাই বলে মা-মেয়ে বন্ধুর মত। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু এইসব কথা শুনলে তিনি মেয়েকে বুঝবার চেষ্টা না করেই বান্ধবীর মত আচরণ না করে মায়ের মতই কথা বলে উঠবেন। তরুণ-তরুণী-দেরকে বুঝতে হলে ওদের মত চিন্তা-ভাবনা করেই বুঝতে হবে।

আর তা যদি না হয় এই সব ছোট- ছোট মিথ্যা কথাই এক সময় বিরাট আকার ধারণ করে। ওরাই যদি বিপথে চালিতে হয় তা হলে দেশের ভবিষ্যতে অন্ধকার ছাড়া কিছুই থাকবে না।■

পর্যটন

শ্রী স্বরাজ চৌধুরী
স্নাতক ২য় বর্ষ

পর্যটন বা ট্যুরিজম কথাটি ল্যাটিন Tornos বা হিব্রু Torah শব্দ থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ চক্রাকারে ঘোরাই শুধু নয়, কোন স্থান সম্পর্কে ঔৎসুক্য নিয়ে ভ্রমণ। ভ্রমণ মানে চলা। ভ্রমণ মানুষকে শিখায় অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা। ভ্রমণ থেকে আমরা যেমন আনন্দ লাভ করে থাকি- তেমনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করি।

উপনিষদ বলেছে, 'চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদু মদুম্বরম,' অর্থাৎ চলাটাই পরম মধু লাভ, চলাটাই স্বাদু ফল। কিন্তু সবাই চলার ব্যাপারে আগ্রহ করেনা। কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়- 'তারাই যথার্থ যাত্রী যারা চলে যায় কেবল যাওয়ারই জন্যে'।

বিশ্ব পর্যটন শুধু শখের ভ্রমণ নয় এটি একটি বিশাল শিল্পও বটে। পথের সৃষ্টি সেই মানব সৃষ্টির কাল থেকে। মানুষ পথে চলে বলেই তা পথের সৌন্দর্য এবং পথের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,- ''পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে-, তাহা বাধাহীন, বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমণ ও জ্ঞানে নহে, পথিক দলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়'।

একথা উঠতে পারে যে ভ্রমণের সাধ অনেকেরই থাকে তবে সাধ্য সবার থাকে না। কিন্তু কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়, কারণ বেড়ানোটা মানুষের একটি অভ্যাসগত রুচি। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যাদের ঘোরার সক্ষম থাকা সত্ত্বেও তারা ঘোরার জন্য উৎসাহিত হয় না। আমাদের দেশে বহু বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে। এই ভারতবর্ষে বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন বরাক উপত্যকায় এমন কিছু স্থান আছে যা ঐতিহাসিক এবং সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির ও বদরপুর ঘাটের প্রাচীন পোর্টটি সেই হিসেবে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। বরাক নদীর তীরে অবস্থিত এই শিব মন্দির সৌন্দর্য ও হিন্দুদের পবিত্র স্থান। প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে এই মন্দিরে।■

লিভটুগেদার বনাম বৈবাহিক সম্পর্ক

মস্তাক আহমদ
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

লিভটুগেদার পাশ্চাত্য জগতের একটি অন্যতম নোংরা সংস্কৃতি। বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষ অবৈধ ভাবে কালাতিপাত করা পশ্চিমীদের চোখে দোষণীয় কিছু নয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা তাদের একটা অহংকারে পরিণত হয়েছে। যার ফলে এরা বিবাহ রীতি নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লিভটুগেদার এর মত জঘন্যতম অশ্লীল, মানবতা বিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডে মগ্ন হয়ে পড়েছে। অথচ নারী-পুরুষ একের প্রতি অপরের প্রয়োজন হচ্ছে – পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, অনাবিল আনন্দ ও মানসিক প্রশন্তি অফুরন্ত ভালোবাসা ও স্নেহ মমতা। প্রকৃতিগত চাহিদার তাগিদে দুটো অস্তিত্ব পরস্পরের সান্নিধ্যের প্রত্যাশী হয় স্বীয় চরিত্রকে পরিচ্ছন্ন ও নিস্কলুষ রাখতে হৃদয়ে প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ করতে। আর এসব কিছু তখনই সম্ভব যখন নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি বিবাহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সব দেশ ও জাতিদের মধ্যে বিবাহের বিপরীত রীতিনীতি রয়েছে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তাদের জীবনে শান্তির লেশ মাত্র নেই। পাশ্চাত্যবাসীদের লিভটুগেদার মানে নারী-পুরুষের দায় দায়িত্বহীন একটি সম্পর্ক। এ নীতিতে নারী-পুরুষ দুজন কারো প্রতি কেউ দায়িত্ববোধ নিয়ে বসবাস করবে না। নিজ পছন্দ নিয়ে পৃথক বসবাস করাই এ সম্পর্কের মূল লক্ষ্য। এটা এমন সম্পর্ক যে, একজনে ভালো লাগা না লাগাতেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের মাঝে বাস্তব ভালোবাসা এবং মাধুর্য, সত্যিকারের স্নেহ মমতা এবং হৃদয়ের প্রশান্তি (যা দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য) খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর এবং হাস্যকর ব্যাপার।

বিবাহেই নর-নারীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র ন্যায্য পন্থা। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানুষের হৃদয়ে যে ভালোবাসার অগ্নিস্ফুলিংগের সৃষ্টি হয় তা তাকে সর্বপ্রকার পাপাচার, ব্যভিচার ও নগ্নতা থেকে রক্ষা করে জীবনকে ঐশী আলোতে উদ্ভাসিত করে। বিবাহিত নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে বসবাস করে। ফলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক প্রীতিময় বন্ধন। তাদের জীবনটা হয়ে ওঠে আনন্দমুখর।

পাশ্চাত্যের লিভটুগেদার ও বৈবাহিক রীতি উভয়ের মাঝে এতবড় তফাত যে, একটির নাম যদি 'জীবন' হয় অপরটির নাম 'মৃত্যু'। একটি মানব সমাজের জন্য আশীর্বাদ আর অপরটি মানব গোষ্ঠির জন্য অভিশাপ। একটি মানবতাকে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির চারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। অন্যটি মানবতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। পাশ্চাত্য সমাজে নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা চিত্তাকর্ষক মনে হলেও বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে তা মানব সমাজে প্রতিদিন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। দিনের পর দিন তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে।■

মানবিকতা

মৌমিতা ভট্টাচার্য
স্নাতক প্রথম বর্ষ

আদিম বন্য মানুষ থেকে আজকের সুসভ্য মানুষ হয়ে ওঠার পিছনে চালিকা শক্তি যদি হয়ে থাকে মানুষের বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি ও আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারিগর হচ্ছে মানুষের চরিত্র।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি বেড়েছে । নিজের ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস মানুষকে করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক। বর্তমানে আমাদের ঘরে ঘরে শিক্ষিত ডিগ্রীধারী মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে নিরন্নের অন্নদাতার । আমরা ভুলে যাচ্ছি নিজের মাতা-পিতা ভাইকে, নিজের সমাজকে, নিজের দেশকে । বর্তমান আমরা অনেক মেধাবী ছাত্র দেখতে পাচ্ছি যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু তাদের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না । দিকে দিকে হিংসা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকোপে সামাজিক জীবন আজ দুর্বিসহ । স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্দশার মূলে শ্রদ্ধার অভাবকে দায়ী করেছেন ।

আজ ভারতবর্ষ তার মেধা ও বুদ্ধির শক্তিতে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অর্থই আনর্থের মূলে দাঁড়িয়েছে । বেশি অর্থ, ক্ষমতার লোভে ভালোবাসা, সততা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী লোপ পেতে বসেছে ।

সুতরাং ছাত্র সমাজের মধ্যে যদি সৎ বীজ বপন হয় তাহলে প্রথম উপকৃত হব আমরাই । আমরা হয়ে উঠব মেধাবী বলিষ্ঠ ও পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার মোকাবিলায় দৃঢ় চিত্ত।■

বর্তমান সমাজ ও ছাত্র রাজনীতি

হাফিজ মোহম্মদ ইমদ হোসেন
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

প্রায় সময়ই সিংহভাগ মানুষের মুখে বলতে শোনা যায় যে, ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই কথাটা বেশ মুখরোচক। কোনও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই কথাটি বলা হয়ে থাকে। বরং দৃঢ়ভাবে ও জোরগলায় বলা যায় যে, সৎ এবং নিষ্ঠাবান তথা সঠিক ছাত্র রাজনীতির অভাবেই আজ দেশের এই করুণ অবস্থা।

আমরা সবাই জানি ইতিহাসের সকল যুগের সকল বড় মানুষেরাই কিন্তু সামাজিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান রেখে গেছেন। যেমন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাত্রদের এক সভায় বলেছিলেন, ''বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে দূরে রাখতে পারেনা, এমনকি তোমাদের মত কিশোর বয়স্কদেরও না। এক্‌জামিন পাশ করা দরকার কিন্তু এ তার চেয়েও বেশী দরকার''। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছেন, ''অধ্যয়ন ছাত্রজীবনের তপস্যা'' এই বচনের মিথ্যা দোহাই দিয়ে অনেকেই ছাত্রদের দেশের কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। আমি ছাত্র হিসাবে মনে করি এরকম করা ঠিক নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন, ''Education can wait but struggle for swarj cannot.'' মাস্টারদা সূর্যসেন ছাত্রদের নিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। এছাড়া ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, আশ্বফাক উল্লাহ, প্রভৃতি বিপ্লবীরাও কিন্তু ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে রাজনীতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন।

অনেকেরই ধারণা যে রাজনীতি ছাত্র সমাজকে এক মহাসর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে, মানুষকে কপট করে, চরিত্র নষ্ট করে। রাজনীতি মানেই গায়ের জোরে মিথ্যা কথা বলা, দাপট দেখানো ইত্যাদি। খুব সাধারণ লোকের কাছে আজকাল পলিটিসিয়ান মানে খুব প্যাচালো লোক, শয়তান ও ধড়িবাজ। অবশ্য ধ্রুবসত্য একটা কথা বলতে দ্বিধানেই যে বর্তমানে ক্ষমতাসীন বড় বড় দলের নেতা ও কর্মীদের হালচাল দেখে সাধারণ মানুষের এ ধারণাটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সব রাজনীতিই খারাপ, চরিত্র নষ্ট করে এ ধারণা বা প্রশ্ন ওঠা কিন্তু কাম্য নয়। বাস্তবে কোনও রাজনীতি চরিত্র নষ্ট করে, আবার কোনও রাজনীতি শুদ্ধ নির্ভেজাল এবং চরিত্রবান মানুষ গড়ে তুলে। যে রাজনীতি শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় অত্যাচারকে রক্ষা করে, গুণ্ডামী করতে শেখায়, মিথ্যা বলতে বাধ্য করে, সেই রাজনীতি মনুষ্যত্বকে হত্যা করে, কাপুরুষ বানায়। আবার যে রাজনীতি অন্যায় অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়, মানুষকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দেয়, মহৎ নীতি আদর্শের সন্ধান দেয়, ক্ষুদ্র শক্তি দিয়েও সাহসের সাথে লড়তে শেখায়, মানুষকে ত্যাগের মহত্ব ও গুরুত্ব বোঝায়- তাই যথার্থ রাজনীতি।

সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে সুস্থ রাজনীতির অতি আবশ্যক। বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ থাকবে কিনা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর প্রেম প্রীতি-ভালোবাসা থাকবে কিনা, ভাইয়ে ভাইয়ে সুসম্পর্ক থাকবে কিনা প্রতি মুহূর্তে অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। নির্ভর করে বিবেক ও হৃদয়বৃত্তির ওপর, আর তা গড়ে ওঠে একটা সমাজের রাজনীতি ও সুস্থ সংস্কৃতির ওপর। অর্থাৎ সুস্থ রাজনীতি যদি না থাকে তবে সুস্থ সংস্কৃতি থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। আজকাল বিষময় রাজনীতির কারণে পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাজনীতির ভালো ও খারাপ, এই দুটি পথকে প্রথমে বেছে বের করতে হবে। কোন রাজনীতি সমাজকে সার্বিকভাবে উন্নতির দিশা দেখাবে। কোন রাজনীতি আমাদের নিজের ও অন্যান্য সকলের কথা ভাবতে শেখাবে। সেই রাজনীতিতেই ছাত্রদের দীক্ষিত হওয়া উচিত। দলীয় কোন্দলে যুক্ত হওয়া বা ভাল মন্দ বিচার না করে কোন দলের অনুগামী হওয়া ছাত্রদের জন্য সুস্থ রাজনীতির পরিচয় নয়। কারণ ছাত্ররাই ভবিষ্যতের দেশ পরিচালক।■

আমাদের সমাজ

পাকিজা বেগম
স্নাতক প্রথমবর্ষ

মানুষ সামাজিক প্রাণী। এই সমাজে মানুষ নিজের শক্তি এবং যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে। আর এই যোগ্যতা অনুসারে কাজ করাই তাদেরে প্রধান কর্তব্য। সমাজ হল এই স্থান যেখানে মানুষ নিজের পরিচয় বানাতে পারে। আজকের দিনে মানুষ নিজের পরিচয় বানাতে গিয়ে ভাল হওয়ার নাটক করে। কিন্তু সত্য এই যে মানুষ স্বার্থপর। আমরা সমাজকে দেখাই কিছু এবং অন্তরে থাকে অন্য কিছু। সমাজ ন্যায়ের পথে এগিয়ে চলতে চায়।

মানুষ সমাজে নানা ধরনের পরিস্থিতি এবং সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন জাত-পাত, উঁচু-নিচু আর এইসব কারণে সমাজে ভেদাভেদ উৎপন্ন হয়। মানুষ এই ভেদাভেদকে কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সমাজের মানুষরা একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। অর্থাৎ সমাজ যা বলবে তা মানুষকে করতেই হবে। আর এই কাজ যদি মানুষ না করে তাহলে সমাজ তাকে শাস্তি দেয়। সমাজ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু সব মানুষ এই সঠিক পথ অবলম্বন করতে চায় না। সমাজ মানুষকে ভালোর দিকে নিয়ে যেতে চায়। সমাজ মানুষকে অনেক ভালো ভালো জিনিস দান করে কিন্তু এই জিনিস অনেকে গ্রহণ করে আবার অনেকে গ্রহণ করে না। যারা সমাজের দান করা জিনিস গ্রহণ করে না তারা তাদের জীবনে কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে না। তারা তাদের জীবনকে কখনও সামনের দিকে অগ্রসর করতে পারে না। তারা তাদের জীবনকে একঘেয়েমি করে রাখে। আর যারা সমাজের দান করা জিনিস গ্রহণ করে তারা তাদের জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করে। এই মানুষরা নিজের শক্তি, বুদ্ধি ও কর্মের দ্বারা সমাজে অনেক ভাল কাজ করে তারা তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখে। আবার সমাজে অনেক স্বার্থপর মানুষও আছে যারা একে অপরের ভাল কাজ সহ্য করতে পারে না।

মানুষ সমাজে ভাল কাজ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কষ্ট করে। অনেক সময় মানুষ এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে দিশাহারা হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে গুণের সীমা অপরিসীম। মানুষের মধ্যে ত্যাগ করার এবং সহ্য করার ক্ষমতা প্রচুর। সমাজ যখন আমাদেরকে উঁচু স্থান দেয় তখন আমরা অত্যন্ত খুশি হই। আর এই সমাজে যখন আমরা খারাপ কাজ করি তখন সমাজ আমাদেরকে অপমান করে। যার জন্য আজ সংসারে সমানতা নেই। সমাজের মানুষরা সবাই একে অন্যের থেকে বড় হতে চায়। তার সবসময় চেষ্টা থাকে সে যেন সমাজে উঁচু স্থান লাভ করতে পারে।

সমাজে ভাল এবং মন্দ দুই উপাদানই রয়েছে। মানুষ হিসাবে আমাদের যথাযথ কর্তব্য হল সমাজের বিশুদ্ধ উপাদানকে গ্রহণ করে নিজেকে এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব জাগিয়ে তোলা এবং দূষিত উপাদানগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সমাজকে একটি প্রতিষ্ঠিত স্থানে দাঁড় করানো। তবেই একটি সুন্দর সমাজ বলে প্রতিষ্ঠিত হবে, নতুবা নয়।■

''কবিতা পাঠক মনে অনুভূতি ও আবেগ সঞ্চারিত করে। কিন্তু ইহার সঙ্গে যদি অতিজ্ঞতার দিকটি ব্যক্ত না হয় তবে রসোপলব্ধি ঘটে না। অনুভূতি ও মনন এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত।''

- ড. ভবানী গোপাল সান্যাল।

''কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।''

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভালোবাসার টানে

রূপালী মজুমদার
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

কেন যে আমার আসাম এতো ভাল লাগে,
কালীপদ, শ্রীকান্ত, মানস, সন্তোষ, সঞ্চিতা
তোমাদের মত কবিদের সাথে দেখা হয়নি আগে।
তবুও শুধু পত্র বিনিময়ে হয়ে গেছে ভালোবাসা
তোমাদের সাথে দেখা হবে কোনদিন প্রিয় সাথি,
বহু দূর থেকে আমার মনে জাগে এই আশা।
আসামে পাহাড়ের দেশে তোমরা যে থাকো
আমি ও থাকি সুন্দর হিমালয় পাহাড়ের কাছে,
মাস ঘুরে, বছর যায়, তবুও আমাদের দেখা হয়নাকো,
ক্ষতি কী তবু লেখনিতে প্রাণের টান তো আছে।■

মন যে আমার মাকে ডাকে

জয়দেব দাস
উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথমবর্ষ

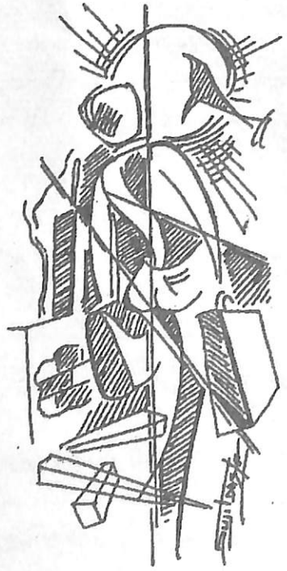

বারো মাসে বারো পূজা
আসে না কেন দুর্গাপূজা
জানালা দিয়ে তাকাই দূরে
সুদূর–নীলাকালে
মনে হয় যেন মা আমার দিকে
চাইছেন অনিমেষে।
আশ্বিন মাসের অম্বিকা পূজা
কাছে এসেছে দুর্গা পূজা
পূজার বাতাস বইছে যে দিক দিগন্তে।
মা আসবেন বুঝি পালকি চড়ে
মায়ের পূজা আসছে কাছে
ঘুম হয় না কোনও মতে।
শিশির ভেজা হাওয়া বহে
ফুলের গন্ধ আসে –
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে পড়ে,
কবে বুঝি মা আসবেন মণ্ডপ চত্বরে
মাকে দেব ফুল, চন্দন অসীম ভক্তিভরে।■

।। হে দয়াময় ।।

জুলফিকার জালালি
স্নাতক প্রথমবর্ষ

শয়নে স্বপনে নিশীথ ভবনে
সুখ ও অপার আনন্দ মনে
তুমি থাক আমার সনে
কিসের জন্য জানিনা প্রাণে
ব্যাকুল মনে ঘুরি বনে বনে
তুমি দাওনি আশা, তবুও বেঁধেছি বাসা
তুমি যে আমার আশা
আমি ভালোবাসি তোমায়
আমি ভালোবাসি তোমায়
হে দয়াময়...
হে দয়াময়...।■

।। প্রথম দেখা ।।

রুমাশ্রী দাস
উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ

প্রথম যেদিন দেখেছি তোমায়,
হৃদয়ে লেগেছে ভালো।
মনেহয় পৃথিবীর চারদিকে যেন,
জেগেছে নতুন আলো।
যেদিকে তাকাই শুধু দেখতে পাই,
তোমারই প্রতিচ্ছবি।
চারদিকে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে,
প্রেমেরই রাঙা রবি।
বন্ধুরা বলে তুমি কে আমার,
নাহি কিছু তারা জানে।
প্রিয়তম হয়ে রয়েছ আমার,
নিষ্পাপ এই প্রাণে।।■

যদি হারিয়ে যাও

রৌসনারা বেগম তালুকদার
স্নাতক প্রথমবর্ষ

যদি তুমি হারিয়ে যাও
লিখব একটা কবিতা
কবিতার নাম হবে কষ্ট
মন যদি ভেঙে হয় নষ্ট
নষ্ট মনের আগুন
সখীকে জানাই
তোমাকে খুঁজে আমি
কোথায় পাই
তুমি সদা পাশে থাক
এই আমি চাই
তোমাকে নিয়ে আমি
স্বপ্ন সাজাই
তোমাকে নিয়ে আমি
পাই সর্ব সুখ
যদি তুমি হারিয়ে যাও
নাই তার চেয়ে দুখ
তুমি হলে এ জীবনের আলো .
তুমি ছাড়া মনের আগুন
বুঝবেনা কেও
সখী সদা পাশে থাকে
বুঝবেনা সেও।■

এর নাম জীবন

কমরুল জালাম
স্নাতক প্রথমবর্ষ

নিজে যদি না পারো হাসতে
তবে অন্যকে কাঁদাও কেন?
নিজে যদি সুখে না থাক
তবে অন্যকে দুঃখ দাও কেন?
যদি চাও ভালো করে বাঁচতে
শেখো তুমি সকলকে ভালোবাসতে
জেনে রেখো দুঃখের মাঝে
লুকিয়ে আছে সুখ।
কখনো কান্না, কখনো হাসি
এই নিয়েতো গড়া জীবন।
কখনো বা পিছলে পড়া,
কখনো বা থমকে দাঁড়া,
কখনো বা এগিয়ে চলা,
এই তো জীবন।■

ছয় ঋতু

রুমি বড়াল,
স্নাতক দ্বিতীয়বর্ষ

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম ঋতু
পাকে নানা ফল,
আষাঢ় মাসে বর্ষা ঋতু
খেতে ভরা জল।
ভাদ্র-আশ্বিন শরৎ ঋতু
দুর্গা পূজার মেলা,
কার্তিক-অগ্রহায়ন হেমন্ত ঋতু
ফসল তোলার পালা।
পৌষ-মাঘেতে শীত ঋতু
ঘন কুয়াশা পড়ে,
ফাল্গুন-চৈত্র বসন্ত ঋতু
নতুন পাতা নড়ে।■

মাতৃ আক্ষেপ

প্রিয়াঙ্কা ধর
স্নাতক প্রথমবর্ষ

জন্মনিল সোনালী শিশু শিশুর সারল্যে,
পূর্ণকরল মাতৃহৃদয় অগাধ তৃপ্তিতে।
পিতৃতেজে প্রকাশমান অনন্ত অম্বরে,
ঘুচাবে আঁধার নিশি মানব কল্যাণ।

নিরন্তর কাটছে মায়া –
সীমাহীন পথরেখা যায় নাতো ছোঁয়া।
হাসির বন্যা ঝরে পড়ে ধরায়,
বিদীর্ণ হয় বক্ষস্থল জোয়ার ভাটায়।

চন্দ্রমা নয় যেন, বিষাক্ত শ্বাস।
তিল ঠাঁই নেই আর
শুধু হা-হুতাশ।

বিষময় জ্যোতি, অকরুণ আঁখি।
রক্ত পিপাসু রাক্ষসের মূর্তি,
দুঃখের অশ্রুজলে ভরছে বারিধি,
করব না বর্ধন আর নিজ পরিধি।■

হারানো হৃদয়

অনন্যা গুপ্ত
স্নাতক প্রথমবর্ষ

হে মোর প্রিয়, প্রিয়তমা মোর,
কোথা ছিলে লুকিয়ে, কোন বন্ধনের ডোরে
গগনের ওপারে।
কোথা ছিলে তুমি, কোথা ছিল তোমার প্রেমময় মন,
কোথা ছিলে তুমি, কোথা ছিল তোমার আকুল-হৃদয়-
খুঁজেছি তোমায় পথে পথে
খুঁজেছি তোমায় গগনে-গগনে,
আজ পেয়েছি তোমায়, পেয়েছি তোমার প্রাণ
পেয়েছি তোমার হৃদয়, শুনেছি তোমার গান।
কি বলব আমি আজ! কি করব আমি আজ!
খুশিতে আমার হৃদয় উথলে উঠেছে আজ।
জীবনের যত জোয়ার ছিল, ছিল যত যন্ত্রণা,
ভেঙে মুছে শেষ হয়ে গেছে, পেয়েছি যত কু-মন্ত্রণা।
তোমার আবেগে, তোমার পরশে হয়েছি আমি যোগমায়া
তোমার প্রেয়সি হয়েই গেয়ে যাব যত আছে মিলনের মোহমায়া।■

কলমের কালি

আলপনা দাস
উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ

যত কিছু লেখা হয় এই পৃথিবীতে।
সব কিছু রঙিন হয়ে আছে কলমের কালিতে।।
কলমের কালি দিয়ে কবি লেখেন পদ্য।
কলমের কালি দিয়ে লেখক লেখেন গদ্য।।
কলমের কালি হল পৃথিবীর সেরা।
কলমের কালি দিয়ে সাদা কাগজ ঘেরা।।
কলমের কালি হতে পারে কালো ।
কিন্তু কলমের কালি জগৎ করেছে আলো।।
রঙিন কালি দিয়ে আঁকা হয় কত রকমের ছবি।
কলমের কালি দিয়ে কবিতা লিখে অমর হয়েছেন কত কবি।।
কলমের কালি দেখতে লাগে অল্প।
লিখতে লিখতে হয়ে যায় অনেক বড় গল্প।।
কলমের কালি এই পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে।
এই সুন্দর পৃথিবীটা উজ্জ্বল করে রাখবে।।■

আমার যাত্রা পথ

রোস্তমা বেগম
স্নাতক তৃতীয়বর্ষ

সারা রাত্রি অঝোরধারা বৃষ্টির ডাক শুনে,
আমি জেগেছিলাম কাক ভোরে।
আমার ছিল সংকল্প, আজ ভোরে পার হব তেপান্তরের
সীমান্ত।
আমার আশা হল, ব্যর্থ মনোরথ,
দেখলাম যখন জলে ভাসমান আমার যাত্রাপথ।
আমি আশাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে,
আমার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে।
নিরাশ মনে ভাবছিলাম, ফিরে যাব ঘরে,
ক্ষণিক পরে দেখি একছোট্ট ডিঙি ফিরছে পারে
হাজার রকম বাঁধা বিপত্তি কাটিয়ে,
অবশেষে উঠলাম সে তরীতে।
আজ আমার তরী চলছে নিভৃতে,
কখনো উজানে, কখনো ভাটিয়ালে।
জানিনা কোনো কালে পারবকি পৌঁছতে
আমার প্রত্যাশিত ঠিকানার সন্ধানে।■

ফুলের সেরা গোলাপ

সৃজাতা দাস
উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ

আমাদের চারপাশে কত ফুল আছে।
তাদের মধ্যে গোলাপ ফুলও রয়েছে।।
গোলাপ ফুলকে হিংসা করে অন্য ফুল মারতে যদি চায়
গোলাপ ফুলের কাঁটা তাকে কেটেছুড়ে খায়।।
তাই তো গোলাপ ফুল সবচেয়ে সেরা।
গোলাপ ফুলের ডালে ডালে কাঁটা দিয়ে ঘেরা।।
গোলাপ ফুল হল প্রকৃতির দান।
তাই তো আমরা সবাই গোলাপকে করি সম্মান।।
গোলাপ ফুলের পাপড়ি এত যে কোমল।
তাই এই ফুল জুড়িয়েছে সবাইর মন।।
গোলাপ ফুলকে পৃথিবীতে সবাই ভালোবাসে।
এইজন্য গোলাপ ফুল অমর হয়ে আছে।।■

হতে পারি...

হায়দর আলী
উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ

আমি বৃষ্টি হতে পারি...
যদি মেঘ এনে দাও।
আমি পথ হতে পারি...
যদি চিহ্ন ফেলে দাও।
আমি ফুল হতে পারি...
যদি সুগন্ধ এনে দাও।
আমি সূর্য হতে পারি...
যদি কিরণ এনে দাও।
আমি স্বপ্ন হতে পারি...
যদি ঘুম এনে দাও।
আমি ছায়া হতে পারি...
যদি আলো এনে দাও।
আমি বই হতে পারি...
যদি পৃষ্ঠা এনে দাও,
আমি গান হতে পারি...
যদি সুর এনে দাও,
আমি বন্ধু হতে পারি...
যদি হাত বাড়িয়ে দাও।■

ছন্দ নেই

অশ্রোতা চৌধুরী
স্নাতক ৩য় বর্ষ

'রাতে'
ঘুমিয়ে ছিলাম,
কিসের যেন বিকট চিৎকার শুনে ঘুমটা
ভেঙে গেলো,
তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহে ও মনে বুঝতে পেলাম বাইরে
কিসের যেন আওয়াজ হচ্ছে
শুনে মনটা আঁতকে উঠল।
চোর ডাকাত নয় তো
ভয় পেলেও
শোনার চেষ্টা করলাম।
শুনলাম — মন দিয়ে শুনলাম—
বুঝতে বেশ কষ্ট হল
কিন্তু বুঝলাম।।
আসলে তা কিছুই নয়— বুঝলাম—
কিছু হিংস্র 'সারমেয়োর' দল
খাদ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে
কিছুক্ষণ পর সব শব্দ-নিস্তব্ধ হয়ে গেল,
সবাই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।
পরদিন সকালে উঠেই খবরের কাগজটা পড়লাম
পড়তে পড়তে চোখে জল এসে গেল,
হায়রে শ্রেষ্ঠ মানব সভ্যতা...ছিঃ
ছিঃ ছিঃ...।।■

কোথায় স্বপ্নপুরী

সুতপা ভট্টাচার্য
উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথমবর্ষ

দূর দিগন্তে নীল গগনে উড়ছে একটি পাখি,
চলছে সে পথ উদাস মনে নেই কোন তার সাথি।
গোপন মনে কত আশা, নেই কোন তার বাসা;
জানে না সে কোনোই মানা, বিচ্ছেদ ভেদ বাঁধা।।
সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার যাবে পঙ্খিরাজে
পৌঁছোবে সে নতুন দেশে মিলবে সখার সাথে।।
জানে না সে জাতি-বিজাতি হৃদয় ভরা প্রেম প্রীতি,
মিলবে সে সবার সাথে ভালোবাসার জোরে।
আশার-জোয়ারে চিত্তমাঝে নৃত্যে ভোলা মন-ময়ূরী,
হায়! কোথা তার পঙ্খিরাজ, কোথায় স্বপ্নপুরী?
হঠাৎ দুটি সবল ডানা শিথিল হয়ে পড়ল ঢলে,
তীব্র আওয়াজে কাঁপল আকাশ বিষিয়ে উঠল দেহমনে।■

পূজোর দিনে

রূপা সেন
উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ

নতুন সাজে সাজব আমরা
পূজোর সেই দিনে।
পূজোর দিনে তোমায় দেখে একটু একটু
ভালোবেসেছি!
'মা' গো তুমি আসবে কবে?
তোমারই অপেক্ষায়।
আমার যৌবনে তোমারই প্রতিচ্ছবি
ছড়িয়ে দাও গো 'মা'।।■

ভারতের ক্রিকেট

মিঠু সাহা
স্নাতক প্রথম বর্ষ

ভারতের ক্রিকেট সবার জান ও প্রাণ
তাই শচিন, সৌরভ, দ্রাবিড় সবার ভগবান
ব্যাট হাতে সিক্সার মারেন যখন সৌরভ
একবাক্যে সবাই বলে তুমিই ভারতের গৌরব
ক্রিজে ব্যাট হাতে নিয়ে আসেন যখন যুবরাজ
বিপক্ষ দলের ওপর তখন চালান নিজ স্বরাজ
বল হাতে নেন যখন ইরফান
এক দুই করে সবাইকে প্যাভিলিয়ান পাঠন
অস্ট্রেলিয়ার মত দলের যিনি উড়ান ধজ্জি
তিনি হলেন ভারতের অফ্‌স্পিনার ভজ্জি।■

ফ্রি

মণ্টি তালুকদার
উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথমবর্ষ

টিভি নিলে ছবি ফ্রি,
গাঈ নিলে গোবর।
আলু নিলে সব্জি ফ্রি,
ইতিহাস নিলে বাবর।।
টর্চ নিলে বেটারি ফ্রি,
চাল নিলে ভাত।
কেদারা নিলে কাঠ ফ্রি,
নামতা নিলে সাত।।
তালা নিলে চাবি ফ্রি,
খাতা নিলে কাগজ।
ঘড়ি নিলে ঘণ্টা ফ্রি
অঙ্ক নিলে মগজ।।
চিনি নিলে মিষ্টি ফ্রি,
মাছ নিলে কাঁটা
কলম নিলে কালি ফ্রি
রুটি নিলে আটা।।
সাইকেল নিলে টায়ার ফ্রি,
পয়সা দিলে এডমিশন।
গাড়ি নিলে স্টেয়ারিং ফ্রি,
পরীক্ষা দিলে টেনশন।।■

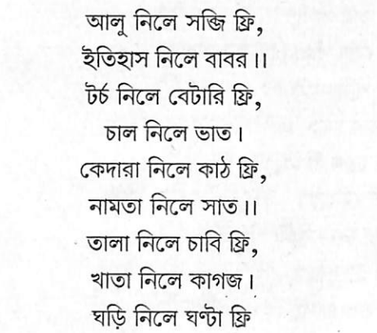

আত্ম-বিরহ

পিয়াল দে
উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ

জীবনে চলার পথে অনেক পড়েছি, অনেক উঠেছি
হোঁচট খেয়ে খেয়ে ছোট থেকে বড় হয়েছি
ছোটবেলার জীবনটা ছিল মুক্ত
বর্তমানে মানুষের জীবন দুঃখকষ্টে যুক্ত
এই দুঃখ-কষ্ট পেয়ে না পারি কাঁদতে
না পারি সইতে, না পারি বলতে
হাসতে মন চায়, তবুও হাসতে পারি না
মনে আসে বহু কথা তবুও বলতে পারি না
মুখে আসে কথা, প্রকাশ করতে পারি না মনের ব্যথা
ঘিরে যায় মন রাত্রির অন্ধকারে
প্রভাতের সূর্য কিরণ আনে খুশির আশা নিয়ে
কৌতূহল ভরা মন, জানতে চায়, বুঝতে চায়,
কে কার আপনজন?■

উমা

দেবশ্রী গোস্বামী
(প্রাক্তন ছাত্রী)

'বর্ষা দিদি, বর্ষা দিদি' বলে দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ। বর্ষা এই কড়া নাড়বার শব্দের জন্যই সকাল থেকে অপেক্ষা করছিল। দরজা খুলে দেখল রাহুল প্রতিবারের মত এবারও এসেছে। রাহুল রায় পাড়ায় যে কালীমন্দির আছে, সেখানকার পুরোহিতের ছেলে। ছেলে হিসেবে সে খুব ভাল। প্রতিবছর আজকের দিনে সে বর্ষার বাড়ি আসে মা দুর্গার মূর্তি বানাবার মাটি নিতে। বর্ষা রাহুলকে নিজের ছোট্ ভাইয়ের মত দেখে আর এই ভাই বছরে শুধু একটি দিনের জন্যই দিদির কাছে আসে বলে দিদি ভাইয়ের জন্য সকাল থেকে উঠে নিজের হাতে খাবার-দাবার বানিয়ে রাখে। আজ-ও তার ব্যতিক্রম হল না। রাহুল খাবার খেতে খেতে বলল এই সামনের মাঘ মাসে তার দিদি উমার বিয়ে। খাবার শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে সে মাতৃ প্রতিমার মাটি নিয়ে চলে গেল। সেই সঙ্গে দিদির মনে দিয়ে গেল ভাইয়ের জন্য আরও একবছরের অপেক্ষা।

ভদ্রলোক বলতে এ পাড়ায় কেউ আসে না। ভদ্র কথা, ভদ্রভাষা এখানে দুর্লভ। এই একটি দিনেই বর্ষা রাহুলের সাথে কথা বলে মনে অনেক শান্তি পায়। রাহুল চলে যাবার পর কেন জানি বর্ষাকে বার বার রাহুলের দিদি উমার বিয়ের কথাটা আঘাত করছিল। বর্ষা খোলা জানালার কাছে গিয়ে বিশাল আকাশের দিকে দেখতে দেখতে নিজের ফেলে আসা জীবনে কখন যে ডুব দিল তা সে বলতেই পারে না।

ছোট্ট গ্রাম, নাম রাণীগঞ্জ। সেই গ্রামই মহা নবমীর দিন জন্ম নেয় এক ফুট্ ফুটে শিশু কন্যা। মা বাবা আহ্লাদ করে মেয়ের নাম দিলেন উমা। উমার বাবা ছিলেন চাকুরিজীবী। কমাত্র মেয়ে উমা। হাসিখুশি পরিবার। পড়াশোনা, গানবাজনা সব কিছুতেই ছিল তার দুরন্ত পারদর্শিতা। এভাবে উমা মা-বাবার আদর-যত্নে বেড়ে উঠতে শুরু করল। সে মাধ্যমিকেও দুরন্ত সফলতা নিয়ে উত্তীর্ণ হল। বাবা মেয়েকে ভর্তি করালেন উচ্চমাধ্যমিকে। উচ্চমাধ্যমিকেরই ১ম বছর ভাগ্যদেবী হলেন বিমুখ উমার প্রতি। মিথ্যে ঘুষ খাওয়ার অপরাধে বাবার চাকুরি গেল। উমা পড়াশোনার ফাঁকে টিউশানি ধরল, মা ধরলেন সেলাই। মিথ্যে অপবাদের দায় সহ্য করতে না পেরে বাবা আক্রান্ত হলেন হৃদরোগে। উমা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সংসারকে বাঁচানোর। বাবার চিকিৎসার ও যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছে সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু দুঃসময়ে যা হয়, বাবা মারা গেলেন। এখন শুধু মা আর মেয়ে। কষ্টের সংসার। উমা এ সবের মধ্যেও উচ্চমাধ্যমিকে ভালোই রেজাল্ট নিয়ে পাশ করল।

মার ইচ্ছে এবার মেয়েকে সৎপাত্রে দান করে নিশ্চিন্ত হবেন। মেয়েকে আর পড়াবেন না। বাপ মরা মেয়ে। উমা প্রথমে আপত্তি করল, এবং পরে মার কথায় বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। উমার মা ছিলেন তিন ভাইয়ের এক বোন। বোনকে কন্যাদায় মুক্ত করার জন্য উমার তিন মামা এবার নিজেদের একমাত্র ভাগনির জন্য পাত্র দেখতে শুরু করলেন। তাঁরা উমার মাকে বললেন— ''তোর কোন চিন্তা নেই বোন, আমরা এমন পাত্রের সাথে তোর মেয়েকে বিয়ে দেব যে রাজরাণীর মত থাকবে''। ১২ মাঘ, গোধূলি লগ্নে রেলে কর্মরত এক পাত্রের সাথে উমার বিয়ে হল। উমার মা এবার কন্যাদায় মুক্ত হয়ে অনেক খুশি। তিনি সত্যি সত্যি ভাইদের কথায় মেয়েকে যোগ্যপাত্রে দান করলেন তো?

মামারা জেনে শুনে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে মানসিক ভাবে বিকৃত ছেলের কাছে বলি দিলেন এই ফুটফুটে, সুন্দর নিষ্পাপ উনিশ বছরের মেয়েটিকে। বিয়ের একসপ্তাহের মধ্যে উমা মামাদের এই অপকর্মের কথা জানতে পারল এবং বুঝতে পারল যে, মামারাই ওর মাকে ঠকিয়েছে। উমার বর কখনও উমাকে ভালোবাসে, কখনও দূর দূর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, আবার কখনও তাকে চিনতেই পারে না। যা আপাত দৃষ্টিতে এতটা ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে তার সাথে থাকলে। উমা ভাবল এ সব কিছু মাকে বলা উচিত, কিন্তু বলবে কী করে। শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ সবাই যেন সব সময় নজর রাখছে উমার উপর। উমাকে ওরা মার কাছে যেতে দেয় না, মার সাথে উমা ফোনে কথা বললে সামনে বসে থাকে। আর সব সময় একই কথা — ''যদি মাকে জানাও তাহলে মা মেয়ে দুইজনেরই সর্বনাশ হবে।'' এভাবে তিন মাস কেটে গেল, মা ভাবলেন একটু মেয়েকে দেখেই আসি। কিন্তু মেয়ের সাথে মার আর দেখা হল না। মেয়েকে দেখতে আসার পথে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল মায়ের, নিভে গেল উমার শেষ আশার প্রদীপ।

উমার শ্বশুরবাড়ি এখন তার উপর হাত তুলতে শুরু করেছে, বাড়ির কাজের লোক ছাড়িয়ে দেয়ার ফলে ঝিয়ের সব কাজ করতে হয় তাকে। বিয়ের সময় শুনেছিল তার স্বামী নাকি রেলে চাকুরি করে। মিথ্যে, সব মিথ্যে। সে কিছুই করে না, পাগলের আবার চাকরি। বরং ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাকে ওষুধ গেলানো আর তার পাগলামী সামলানো। এভাবে বিয়ের একবছর কেটে গেল। উমার জীবনে কিছুই নেই। আছে শুধু এই শ্বশুরবাড়ির অকথ্য অত্যাচার। উমা এই অসহ্য অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য একদিন রাতের অন্ধকারে কোনো কিছুই না ভেবে শ্বশুরবাড়ির কারাগার থেকে পালালো। তখন মধ্যরাত্রি, উঠল এসে স্টেশনে। পেয়ে গেল শহরে যাবার শেষ ট্রেনটা এখন উমার মনে অনেক আনন্দ সে আজ মুক্ত। মুক্তির আনন্দে সিটে বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সে বলতেই পারে না। সকাল তখন সাতটা আটটা হবে উমার ঘুম ভাঙলো। রাতে ভালো করে খেয়াল করেনি তার সহযাত্রী কারা, এখন দেখল তার সাথে এক মাঝ বয়সী ভদ্র মহিলা বসা আর উল্টো সিটে দুই ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলাকে দেখে ভাল ভদ্র মনে হচ্ছে। ভদ্র মহিলা উমার সাথে কথা বললেন। কথায় কথায় উমা সরল মনে তার ঘর থেকে পালিয়ে আসার কথা, তার সব দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলে ফেলল। ভদ্র মহিলা এবং উল্টো সিটে বসা এক ভদ্রলোক (ভদ্র মহিলার স্বামী) উমাকে বললেন – ''দেখো তোমার সব কিছুই তো শুনলাম, তুমি যদি ইচ্ছে কর আমাদের সাথে থাকতে পার। আসলে আমাদের কোন ছেলে মেয়ে নেই, ঘরে শুধু আমরা দুজন। তুমি আমাদের সাথে থাকলে আমাদেরই ভালো লাগবে আর তুমি লেখাপড়া জানো নিশ্চয়ই, একটা চাকরির সন্ধান করে নিতে পারবে। যত দিন তোমার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা না হচ্ছে আমাদের সাথে থাকবে। ভদ্রলোকের এ কথাটা উমার মনে নাড়া দিল কারণ ওদের যেমন সন্তান নেই ঠিক তেমনিই তো সেও হারিয়েছে তার মা-বাবা। তাই উমা ওদেরকে বিশ্বাস করে ওদের সাথেই নেমে পড়ল ট্রেন থেকে।

স্টেশনের সামনেই ওদের বাড়ি, ঘরে ঢুকেই ভদ্রমহিলা স্নান সেরে দুপুরের খাবার বানালেন, দুপুরের খাবার খেতে খেতে তিনি উমাকে বললেন — ''আজ বিকেলে তোমায় আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে যাব''। ঘুরতে যাবার কথা শুনে উমার সে কি আনন্দ। সেই যে বিয়ের আগে মা, বান্ধবীদের সাথে ঘুরতে যেত আর আজ যাবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেলবেলা ভদ্রমহিলা নিজের হাতে উমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বান্ধবীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

দরজায় কড়া নাড়লেন, এক অল্প বয়সী মেয়ে এসে দরজা খুলল। উমারা সামনের ঘরে বসল। এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন, নাম রূপসা। তিনি উমার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। যা উমার ভাল লাগলো না। উমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– ''ক্যায়া চিজ হ্যায়''। সেই কথা শুনে উমা বুঝতে পারল এ নিশ্চয় কোনো খারাপ জায়গায় সে চলে এসেছে। উমা সেখান থেকে চলে আসতে চাইল। কিন্তু চাইলেও সে আর সেখান থেকে আসতে পারল না। বরং রূপসার বাড়ি থেকে তাকে রেশমী বাঈ-এর ঢেড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। যাদের হাত ধরে সে এই শহরে এসেছে তারা হল এই রেশমীর লোক। রেশমীর দেহের দেউড়ী থেকে পালিয়ে আসার শত চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে পালাতে পারলে ও এখান থেকে আর পারল না। বন্দি পাখির মত শত আর্তনাদ করে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আপন করে নিয়েছে এই কর্দমাক্ত জীবন, এই নরক যন্ত্রণাকে।

উমার নাম পাল্টে হল হল–বর্ষা। এভাবে বর্ষা সাঁত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কোন রাজ্যে চলে গেছে সে নিজেও জানে না। কমলার ডাক শুনে তার স্বপ্ন ঘোর কাটল। কমলা বলল– ''জয়ন্ত বাবু এসেছে''

বর্ষা উত্তর দিল– ''বসতে বল আমি তৈরী হয়ে আসছি''।

বর্ষা মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু মাত্র বাঁচার জন্য জয়ন্তবাবুর মনোরঞ্জনের জন্য তৈরী হল।

আমরা কোন ভদ্র সমাজের কথা বলি, যে সমাজ উমাকে বর্ষা বানিয়ে তোলার কারখানা গড়তে সাহায্য করে। যে সমাজ তাদের ঢেলে দেয় এই অন্ধকার গলিতে যেখান থেকে কোনো আলোর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সমাজ কি কখনও জানতে চায় বর্ষাদের অতীত জীবনের কথা, তাদের উমা থেকে বর্ষা হয়ে উঠার নিদারুন কাহিনি। এই ভদ্র সমাজ কেন বোঝে না যে যাদের দাওয়ার মাটি ছাড়া মায়ের মূর্তি পায় না তার সম্পূর্ণতা, তাদের বঞ্চিত করে এ সমাজ কি হবে সম্পূর্ণ? কখনও কি এই সমাজ উমার হাতে তুলে দেবে না–মা উমার পূজায় ফুল। মা যাদের আপন করেছেন তাদের আপন করতে নিজেদের কাছে টেনে নিতে এই ভদ্রসমাজের কোথায় আপত্তি? নাকি মুখোশ খুলে যাবার ভয়।■

HUMAN RIGHTS IN PRE & POST INDEPENDENT INDIA

Debajyoti Das Gupta
Lecturer, Political Science

The 'Human rights' is a very important issue in contemporary world. In the post world war-II period, various efforts have been made to protect and provide human rights. The UNO took first concrete steps in this regard, and adopted the 'Universal Declaration of Human Rights' on 10th December, 1948. The Declaration contain important basic rights of the human beings, like, right to life, library and security, right to freedom of religion, right to education & culture, right to the enjoyment of an adequate standard of living etc. (Again, the UN General Assembly has adopted the Declaration of the right of the child in 1959, and the Declaration of the elimination of all forms of discrimination against women in December, 1979) India, being a party to the IBHR has therefore moral obligations to adhere to those minimum human rights standards. In this respect a question sometime arises in our mind, what is the position of human rights in India and the role of authority in providing and protecting human rights here. Therefore, an attempt is made in this paper to understand mainly the role of the authority in protecting and promoting human rights in India. (This paper is broadly divided into three parts – (i) Human rights in pre-independent India, (ii) Role of the authority in post-independent India, (iii) Suggestion to uphold rights.)

But before discussing the main theme, let us have a brief idea about the concept 'Human rights' Human rights could be generally defined as rights and liberties which are inherent in our nature and without which we can not live as a human being. Human rights are those rights which are essential for the dignified human existence as well as for the adequate development of human personality. To quote Sridat Ramphal, "Human rights were not born of men but they were born with men". The word 'Human rights' has been defined under the Protection of Human Rights Act. 1993 in following words – 'Human rights mean the rights relating to life, equality & dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the International Covenants'

Human rights, thus, broadly constitute two categories of rights – (i) rights which are essential for the human existence, namely, the right to have basic needs such as, food, clothing, shelter & medical care, and (ii) rights which are essential for the adequate development of human personality such as, the right to education & culture, the right to freedom of speech & expression, the right to free movement etc. Human rights, therefore, not only imply merely civil & political liberties. Infect, the economic & social rights are a prerequisite for the enjoyment of civil & political rights. Human rights are, to quote the Preamble of the UDHR, "a common standard of achievement for all peoples and all nations"

(Human rights as are commonly known more particularly originated in the post 2nd World War period. The UN Charter puts faith in fundamental human rights. The preamble of the UN Charter says, "We the people of the United Nations ... reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity & worth of the human person, in the equal rights of men & women and of nations large or small" However long ago various rights and liberties of the citizens were provided following some great revolutions such as the Glorious Revolution of 1688, the French revolution of 1789 and the Russian Revolution of 1917.)

Human rights in Pre-independent India

India, being the birth place of diverse culture and religions, has very rich heritage of human rights values. It believes in the principle of 'happiness of all' The Rigveda, which is considered to be the oldest document of human civilization declares that all human beings are equal and they are all brothers. To quote justice Jois, "The Vedas including Upanishads were the primordial source of 'Dharma' a comprehensive term for all human rights and duties the observance of which was regarded as essential for securing peace and happiness to individuals as well as society"[2]. During the Vedic age, women were also given equal position with men and like men, they received education.

Despite such rich heritage of human rights and values, there had been barbaric societal violence against women, Children & the so called 'untouchables' The system of 'Widow burning', 'Child Marriage', or Parda Pratha' that were prevalent particularly in the middle ages led to the violation of basic human rights. However, during the British period (in the 19th century) the socio-religious reform movements were launched to fight against such social violence headed by Raja Rammohan Roy. These reform movements were supported by the then authority in India, the British government. The British rulers like Lord Bentinck applied rational mind and came forward to support these movements despite fierce resistance from the then conservative Hindu society. As a result, certain important acts were made to prohibit such social discriminations, such as, 'the Widow burning prohibition Act; 1829, 'the child marriage restraint Act', 1929 Again, the 'Widow Re-marriage Act' 1856 was passed under the initiative of Ishwar Ch. Vidyasagar. These acts were a big milestone towards the promotion of basic human rights.[3]

Further, during the national movement under Gandhiji's leadership, social reform for preservations & promotion of human rights became an integral part of India's freedom struggle. The leaders of our freedom struggle not only fought for political freedom, but also for socio-economic justice. Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar for example, launched movements for various social causes like abolition of untouchability and Harijan's equal rights. The I.N.C. also adopted a resolution specifying fundamental rights of Indians in its Karachi session in 1931. It also passed a resolution for complete independence of India in the Lahore session in 1929. thus, many efforts were during pre-independent India to the protection and promotion of human rights from various quarters. However, the British rule in India was itself a violation of human rights of the Indians-the right to self-determination.

Human rights and the Authority in Post-independent India

The Constitution of independent India includes a chapter on Fundamental rights and another on Directive principals in part – III and IV respectively that reflect the basic principles of the Universal Declaration of Human Rights. (While, the first one being the civil and political rights and legally enforceable and the second group of rights are social and economic in nature and are addressed to the state to implement then by legislation).

As regards the role of the authority in promoting human rights, the state has two major roles to play – (i) as provider of services for public welfare, and (ii) as protector of law and order. In addition to the constitutional provisions, the government in India has enacted various legislations from time to time to protect and promote basic rights of the people, such as, the Hindu Marriage Art, 1955, the Hindu Succession Act 1956, the Untouchability Offences Act1955 (renamed as the Protection of Civil Rights Act in 1976), the Bonded labour system (abolition) Act 1976, the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986 and the like. Steps have been taken in most of the states to provide compulsory primary education (Art 45). Again, the authority or the govt. in India launched various programmes in order to raise the living standard of the people (Art 47), particularly the rural poor, like the Community Development project in 1952, ITDP, NREP,

JRY etc.[4]

However, the authority in India could not provide and project some basic rights to a large number of people despite the constitutional provisions as well as various legislations. We are behind in achieving international standard of human rights. The Human Development Report (HDR) prepared by the UNDP place India as one of the lowest in terms of human development 26.1% of the people in India below poverty line (as per the report of the Planning Commission in 2000). Again, 35.2% of the population is still illiterate, as per the Census of 2001. the authority seems to be unable to prevent discriminations against the women, Children and minorities in India. The practice of untouchability & other forms of social violence continue to occur in our society even after 62 years of independence. Some examples may be cited here –

(i) Child marriage for instance, is still a practice in many parts of India, such as, in the states of Rajasthan, Bihar etc.

(ii) The Ministry of Women & Child development in India recently conducted a study on child abuse (which included Children in vulnerable situation such as, children of poor families, Children at work, children on streets etc.) and reported, that two out of every three children were physically abused. 53.22% children reported having faced one or more forms of sexual abuse. And 48.4% girls reported that they have been the sufferers of gender discriminations.[5]

iii) The Killing of Australian missionary Graham Stuart Stains and his two sons in 1999 in Orissa by one – Dara Singh is a tragic incident of human right violation.

(iv) Again, the state or the authority failed miserably to protect the human rights during the Gujarat riot in 2002, (report NHRC and NCM).

It is rather unfortunate that, there are reports of violation of human rights both by the authority, i.e. state agencies and by the private parties. A large number of innocent people have been the target of extremist groups in Punjab, Jammu and Kashmir and in the North East India. The ULFA's targeting of Hindi speaking people in January 2007 claimed the lives of over 170 people in Assam.[6]

Along with these, the custodial deaths are naked example of violation of human rights by the authority. The death of Monorama Devi in Manipur in 2004, the death of Matahir Ali Talukdar in the custody of Kalain Police in Cachar district of Assam on 20th September 2007 are glaring instances.[7] The authority is also accused of detaining, torturing as well as killing thousands of innocent people in the name of prevention of terrorism in many parts of the country including the North East. In September, 2007, one Smti. Sabitri Rajbangshi was killed by the Assam Police at Namati village in the district of Nalbari in Assam, which created gross resentment among the people.[8]

On many occasions, the agencies like Police and Army have violated the basic human rights of the people under the disguise of TADA, POTA or the prevailing armed Forces Special Power Act. (1958). Unfortunately, the Police in our country often ignore the basic requirement of a civil society. More than 60% of the complaints received by the NHRC relate to the abuse of power and misuse of authority by the Police.9 Again, many people are also killed in the cross-fire between the state agencies and the insurgent groups. (The recent death of Mr. P.C. Ram (in 2007), the Managing Director of Food Corporation of India, North Eastern Region is a case in point). The improper and excessive use of force by the state agencies has resulted anger and protest movements by the people in general. Infact, the failure of the authority or the state to deliver good governance and to protect and uphold human rights of the deprived and marginalized sections, is an important cause for the birth of terrorism. (The Naxalite Movement in India for example, has largely resulted from years

of exploitation and deprivation of the rural poor and the failure of the government to protect and uphold their human rights).[10]

Thus, human rights are violated in India and we are far from providing certain basic rights to the people. It may be however noted that, the Government in India enacted an Act, namely, Protection of Human Rights Act, 1993 which provides for the constitution of a National Human Rights Commission and State Human Rights Commissions in the states for better protection of human rights. But the protection and promotion of human rights in India requires some steps to be taken.

Suggestions for the Protection of Human Rights

The following steps may be suggested towards the promotion of human rights in India –

1) It is the primary responsibility of the authority to provide the basic rights like education, health and minimum standard of living to all people. If human rights are inalienable and inherent, they must apply to all human beings without exception.
2) The State must see that legislations made for the protection of human rights are obeyed. Because, making legislations is not an end in itself. The State or the authority has to prevent all forms of violence against women, children, minorities and other weaker sections of the society.
3) The instances of 'Custodial deaths' must stop. (The states sometimes do not hesitate to claim the 'defense of sovereign' to protect its functionaries who are accused of violation of human rights. But in the case of Smt. Nilbati Behera vs. State of Orissa, the Supreme Court explicitly held that, the defense of sovereign is inapplicable and alien to the concept of guarantee of fundamental rights)[11]
4) The state or the authority may use force or coercion under certain circumstances for the maintenance of law and order and repression of crimes, but it has to be legitimate. It should not lead to unjustified detention, torture of killing of the innocent people.
5) The AFSPA needs modification, so that, the imperatives both of security and of accountable constitutional govt. are maintained.
6) Again, an active and vigilant Human Rights Commissions can help protect and promote human rights in India. Infact, the movement for preservation & protection of human rights is an essential prerequisite for the progress of civilization.
7) But the most important to the protection and promotion of human rights is a general awareness among the people. The state or the authority alone can not promote human rights. The people must know about their rights as well as respect each others right. Since a large number of people in India are still illiterate, therefore, a comprehensive awareness programme of human rights & values needs to be undertaken. We mist learn to live with happiness of all. This calls for greater emphasis on the education & learning of human rights values.

(Thus, it would be appropriate here if we remember the words of Dag Hammerskjoeld, the second Secretary General of the UN, who said. "We know that the question of peace and the question of human rights are closely related, without recognition of human rights, we shall never have peace & it is only within the framework of peace that human rights can be fully developed.") It is therefore high time, that the government in India shifts its emphasis from one of more development to that human development and protection and promotion of human rights of all. Otherwise, if human rights are continued to be violated and basic rights of the people are not realized even after 62 years of independence, the very existence of the authority, i.e. the government is in question.

ENVIRONMENTAL PROTECTION IS A WORSHIP FOR A MUSLIM

Dr. Fazlur Rahman Laskar
Lecturer, Deptt. of Arabic

Man is a social being. He has to live not only for himself but also for others. He owes a great deal to other living creatures. He has to pay attention to the environment. The oxygen that provides the energy to our body has been used many times by many different organisations, and the carbon, hydrogen and other elements from which our body is made have passed through many other bodies during the almost four billion years that life has existed in our planet. All the materials found at the surface of the earth, from the deepest ocean to the top of the atmosphere are engaged in cycles that move from place to place. If the air contains more than 0.1 Parts per million of Nitrogen Dioxide (NO_2) or Sulphur dioxide (SO_2) persons with respiratory complaints may experience breathing difficulties, and if it contains more than about 2.5 PPm of NO_2, healthy persons may also be affected.

It may be observed that the environmental problem has affected different sections of population differently. Several factors have contributed to the environmental degradation.

Pollutions are found of various types in the society. These pollutions not only create harmful effects in the society caused by the policy of rapid development adopted by the state based on unrestricted large scale industrialization, urbanisation, consumerism but also greatly contributed environmental crisis.

Muslims today inhabit a large part of the world which is under-developed, non-industrialised, populous and poverty stricken. Most of the Muslims are strangely silent about the environmental issues. It is mainly because of their illetracy and lack of education.

Prophet Mohammed, peace be on him, strongly ordered the Muslims to be aware of environmental issues. He said, "have mercy on those who are on earth. He who is in heaven will have mercy on you".

In other words, harming, neglecting or exploiting any part of the earth is tantamount to harming or exploiting Allaha's creation.

Prophet Mohammed, peace be on him, wanted to improve the green cover of the earth. He said that even when the hour was high at hand, a sapling could be planted and there would be reward for such an act. He advised us to keep the outer areas of the houses, squares, streets and districts clean. Harmful things lying on the roads should be removed. In Islam, it is an act of worship to remove dirt.

With regard to the preservation of animal life : the prophet said," The one who kills a sparrow for no reason will be questioned about it on the day of Judgement." The Birds' nests must not be destroyed ands neither their young ones nor their eggs be harmed."(Abu Dawood). When a mother bird began to hover over the heads of some Muslims who had taken away its little one, the Prophet, peace be on him, took pity on the mother bird and ordered his companions to restore the young ones to its mother. All games and sports which

give pain to birds and animals are forbidden in Islam. Birds and animals cannot be used as target for shooting practice. Prophet mohammed advised his followers to extend compassion to both human beings and animals.

Rampant industrilisation and unchecked increase in the number of Motor vehicles are held responsible for the menace of environment pollution which ultimately leads to the global warming.

As Muslims, we propose to keep the earth, its air and water bodies clean, safe and pure. We are interested sincerly and deeply, in reducing noise pollution. We celebrate our festivals in an environment-friendly manner. Cleanliness is an integral part of Islamic faith. The world is the handiwork of Allah and saga of his glorification. The Prophet said," Allah is beautiful and He loves beauty. Preserving the beauty of the earth will entitle man to divine love.

Reference : 1) Michael Allaby, basic environmental Science, Routledge, Indian Publication 2005, 2) Post Seminar Proceedings of Radhamadab College, Silchar, February, 2006, 3) Radiance (Views Weekly) New Delhi, 26 October-1 November 2008 issue; pp-14-16, 4) Islamic Voice, September 1992, P-12.

Recipients of Scholarship 2009 :

NABIN CHANDRA COLLEGE, BADARPUR

Doreen Scholarships

1. Aliceline D. Costa (HS Passed)
2. Ananya Gupta (TDC Part - I)
3. Mahbuba Begom Barbhuiya (TDC Part - I)
4. Baharul Islam Bulbul (TDC Part - I)

Mahmudha Begom Memorial Scholarships

1. Ananya Gupta (TDC Part - I)
2. Md. Dilwar Hussain (TDC Passed)

Gaazi Sikender Ahmed Memorial Scholarships

1. Nazira Begom (TDC Part - I)
2. SK. Md. Bilal Uddin (TDC - III)

N. C. College Certificate of Merit

1. Ananya Gupta (TDC Part - I)

THE POSITION OF WOMEN IN ISLAM

Hedayatullah Choudhury
Lecturer, Deptt. of Commerce

Islam sees a woman, whether single or married, as an individual in her own right, with the right to own an dispose of her property and earnings without any guardianship over her, like that of her father, husband or anyone else. She has the right to buy and sell, give gifts and charity, and may spend her money as she pleases. Simply speaking, the woman in Islam has full rights in the same way that man has. No difference at all exists between male and female, except when it comes to physical duties which woman cannot perform, or financial responsibilities, which rests completely on the shoulder of the man.

Sometimes, however, women are exempted from certain duties on physical grounds, such as the duty of fighting to protect one's country and earning a living for the family. To develop this point further, a woman in Islam, whether she is a daughter or sister, a wife or mother or grandmother, has no responsibility to maintain or support herself. This duty belongs to man. If she is a daughter, her father is responsible for her, if a sister, a brother is responsible, if a niece, an uncle, if a wife, her husband. If she is a mother, a son is responsible for her, if a grandmother, a grandson. This responsibility has been prescribed by the law of Islam and if any Muslim tries to escape from fulfilling his duty, the Judge in Islam has a right to take what the woman needs by force from his assets and give it to her. If he continues to neglect his duty the judge is empowered to order the deduction of the required money from his income. And this protection is granted to the woman so that she can lead a good life.

On the other hand, woman in Islam is also entitled to buy and sell and involve herself in any business she chooses, as long as her actions will not affect her honour., and she is entitled to use her money for her benefit through any agency or directly, and no one has a right to take this money from her. Whether he is her husband or Father, unless she gives it to them voluntarily. A marriage dowry is given by the groom to the bride for her own personal use. Furthermore a woman in Islam will keep her maiden name after marriage and this illustrates the amount of independence she still retains even within marriage.

Some people refer to the right of inheritance in Islam, and use it to illustrate that woman has less rights than man, but if we bear in mind the great responsibility born by the man and the fact that the woman bears no responsibility, we will realise the wisdom of giving a man double the rights of inheritance to those accorded to woman. Suppose a man died and left two sons and two daughters, then his patrimony will be divided into six parts and each girl will receive one part and each son will receive two. It may sound unfair if we forget the man's responsibility towards the woman, but if we remember the duty of the son to spend his own money in keeping his sisters and in providing them with suitable home until they get married, we will realise why Islam gives the man a double share in the inheritance.

Marriage in Islam is very important, and Islam does it best to support and protect family life and to save it from any break. Thus a man and a women have both the right to know about each other before getting married, with regard to the standard of the family, the character of its members, their way of life and also to know what the prospective spouse looks like. The woman has every right to refuse anyone who has come to propose marriage to her if she does not wish to accept him as her husband. No one can force her. Her word is the final word, even if their father has previously given his word. Islam also encourages the husband to treat his wife well, as the 'Prophet Mohammad' said 'the best among you are those who are best to their wives'.

CHINUA ACHEBE AND HIS "THINGS FALL APART"

Shakil Ahmed
Lecturer, Deptt. of English

Albert Chinualumogu Achebe (1930-), who was born in Ogidi, Nigeria, came in the forefront for his epoch-making Novels describing the effects of Western customs and values on traditional Africian society. Nigeria has witnessed the flourishing of a new literature since 1950's, which has drawn sustenance from both traditional oral literature and from the present and rapidly changing society. Chinua Achebe, one of the founders of this new literature, has come to be considered as the finest of Nigerian novelists. His achievement, however, has not been limited to his continent and crossing the passage of years, he is considered by many to be one of the best novelists now writing in English language.

Dynamic in personality quiet in demeanour, austere in habits, unostentious in behavior, just in decision, prompt in action, simple in his dress, sympathetic in his dealing-such is our revered Chinua Achebe. He is a living, loving symbol and lively emblem of age-old Igbo culture and civilization. Nothing much need be said here regarding his ideas and attitude towards different issues. For, the central refrain of his life's Music reverberates through every line of his blessed pen. But what is most felt after reading any of his valuable works is its wonderful liveliness. Truly, his writings are not merely outer expressions of his thoughts, but, what is more, infinitely more, emblems and embodiments of his very life-life that merely dances forth in the fortuitous, zigzag way of the world, removing all its obstacles in its inner irresistible urge and boundless boldness. Hence, it is that his works, written in an incredibly simple, sublime, soft and serene way, are so very enchanting, enlivening and exhilarating to all.

Achebe has become the one and only writer by avoiding the imitation of contemporary trends in English literature. Discarding the European conception that "art should be accountable to no one, and (needs) to justify it self to nobody", as he jots it in his book of essays, "Morning Yet on Creation Day", Achebe has embraced instead the idea at the heart of the African oral tradition : that "art is, and always was, at the service of man. Our ancestors created their myths and told their stories for a human purpose" Because of this, Achebe confidently believes that "any good story, any good novel, should have a message, should have a purpose".

Among the West African Anglophone writers, who endeavored to present an authentic picture of the African milieu along with its cultural past, its trauma, its heady independence period from the European Imperial powers, the disillusioning aftermath of post independence era and the present chaos pervading their societies, to the world at large, Chinua Achebe is truly outstanding. He affirms the educational function of literature and establishes a human context for outstanding modern Nigerian history: the first contacts between European and African cultures at the turn of the century in "Things Fall Apart" (1958). Achebe wrote "things fall Apart" as a response to English-centered novels about the savage African jungle peoples, such as "Heart of Darkness" by Joseph Conrad and" Mister Johnson" by Joyce Carey, which use Africa as a metaphor for darkness of the soul and savagery. Achebe wanted to show, from an African point of view, just how civilized the African culture has been, and how the British colonial invaders had destroyed it. Achebe specially succeeded brilliantly in doing this is his magnum opus – "Things Fall Apart", which has achieved the status of the archetypal

modern African novel in English and it has sold more than eight million copies world wide. Time Magazine included the novel in its Time 100 Best English language novels from 1923 to 2005. A 'classic' in every sense of the word, it has become the single best known African novel around the globe, translated into 45 different languages.

"Things Fall Apart" is Achebe's relentlessly unsentimental rendering of Nigerian tribal life before and after the coming of colonialism. Achebe sketches a world in which violence, war and suffering exist, but are balanced by a strong sense of tradition, ritual and social coherence. In "Things Fall Apart", his all time best and maiden novel, the title of which is borrowed from yeats' "The Second Coming", Achebe attempted to show not only the culture of the native society but also the reasons that caused its decay and downfall. Just as western civilization was going through the gyres of anarchy owing to a lack of religious faith in Yeats' vision, so too in Achebe's novel, the onslaught of the white man among things, caused the displacement of the native societies, degeneration of native and unending chaos in Africa.

"Things Fall Apart" delineates the tragic doom of its protagonist Okonokwo, an ambitious, enthusiasistic, authoritative and a powerful chieftain of an lgbo community, who counts on physical brawn and dauntlessness. Okonkwo is the male descendant of a charming ne'er do well, he was worked all his life to overcome his father's weakness and has made an entrance, finally, at his coveted prosperity and even greater reputation among his fellows in the village of Umuofia. Through adamantine donkey-work, Okonkwo has risen to an elevated status in his clan, displaying himself to be skilled in battle and attaining several titles. Okonkwo, a champion wrestler, has taken three wives as a manifestation of manhood, has several children, and has built substantial wealth through his crafting of yams, the staple crop of his village. Okonkwo, a stiff and unyielding man, administers his family with a firm hand and an overbearing demeanor, struggling to demonstrate how he does not have the dilatoriness and weakness traits that individualized his male-begetter. His whole life is dominated by apprehension, the fear of failure and of weakness. It is deeper and more intimate than the anxiety of evil and capricious god and of magic, the fear of the forest, and of the forces of nature, malevolent, red in tooth and claw. Okonkow's fear is greater than these. It is not external but deep within himself. It is the fear of himself, lest he should be found to resemble his father.

Achebe manages to make this stiff man deeply sympathetic. He is acutely fond of his eldest daughter, and also of Ikemefuna, a pubescent lad sent from another; village as compensation for the wrongful death of a young woman from Umuofia. He even feels gratification in his eldest son, in whom he has too often seen his own father. Later, during a funeral for one of the great men of the clan, Okonkwo's gun explodes killing a boy. In accordance with Umofia's law, Okonkwo and his family are exiled to Okonkwo's mother's home village of Mbanta for seven years.

In the first part of the novel, we are introduced to an intact and functioning culture of Igbo. It may have its faults, and it accommodates deviationists like Okonkwo with some difficulty, but it still works as an organic whole. It is in the second part that things begin to fall apart. Okonkwo's exile in Mbanta is not only a personal disaster, but it removes him from his home village at a crucial time so that he returns to a changed world to which he can no longer adapt.

During Okonkwo's exile, the white man arrives at both Umofia and Mbanta. Mr. Brown, a missionary, begins winning converts to Christianity, though generally these are only outcasts or men of law rank. However, with time, the new religion gains momentum. On returning to Umofia, Okonkwo finds the clan sadly changed.

The clan has lost its power to judge itself; a District Commissioner, backed by armed power, judges cases in ignorance. The new power structures meshed badly with the old.

When a convert unmasks one of the clan spirits during a religious meeting, the clan decides that the church will no longer be allowed in Umuofia. They burn down the building. The leaders, including Okonkwo, are quickly seized by District Commissioner. In prison they are humiliated and beaten, and they are held until the clan pays a heavy fine.

After the release of the men, the clan calls a meeting to decide whether they will fight or try to live peacefully with the white people. Okonkwo wants war. During the meeting, court messengers come to order the men to break up their gathering. The clan meetings are at the heart of Umuofia's government; all decisions are reached democratically, and an interference with this institution means the end of the last vestiges of Umuofia's independence. Enraged Okonkwo kills the court messenger. The other court messengers manage to escape because the other clan members do not seize them. Okonkwo knows that his people will not choose war. Embittered and grieving for the destruction of his people's independence, and fearing the humiliation of dying under white law, Okonkwo returns home and hangs himself, which is seen as weak and as an attack against nature, so much so that others from Umuofia cannot touch his body. The District commissioner and his messengers arrive at Umuofia to see Okonkow dead, and are asked to take down his body since Igbo mores forbid clan members to do this.

The crowning glory' of Achebe's novel is undoubtedly his use of the language and aphorisms of oral culture. What sets him apart from other African writers is the fact that he is, by far, more successful than others in flawlessly translating the working of African psyche from one medium to another, from an indigenous oral tradition to an alien form of European origin without obliterating the freshness and vigour of the former, and despite the vast difference separating the two cultures. His language, a major component of his artistic strategy, not only enriches the English language but also gives the reader the experience of a whole culture.

Achebe, who believes that culture uses folklore to pass on great cultural richness, thinks such folklore can provide solutions to a people's questions and problems. Hence folklore, which is an important feature of the Igbo culture, finds ample and appropriate place in the novels of Achebe. The story of the little bird Nza occurs in "Things Fall Apart". It brings home the fact that a man should never provoke his fate. Legend is one of the many elements that lend fascination to "Things Fall Apart".

To conclude, Achebe's feel for the African context has influenced his aesthetic of the novel as well as the technical aspects of his work. As Bruce King comments in introduction to Nigerian Literature: " Achebe was the first Nigerian writer who successfully transmutes the conventions of the novel, a European art from, into African Literature".

ALLEGORICAL INTERPRETATION OF PROSPERO-MIRANDA, ARIEL-CALIBAN IN 'THE TEMPEST'

Dr. Shibtapan Basu

Without the following story it would be hard to interpret the allegorical significance of 'The Tempest- a remarkable drama of Shakespeare. So, at the very outset, I shall tell the story of 'The Tempest' in a nut - shell.

When Prospero, The Duke of Milan was so much rapt in his secret studies, that he grew indifferent to his ducal duties. He entrusted all his work to his brother Antonio, delegating to him fullest authority to do or undo whatever he wished. This fact made Antonio ambitious and he conspired with the King of Naples to oust Prospero from Milan. One night Prospero and his daughter were placed in a rotten boat by Antonio and launched into the unknown sea. Miranda came to the island so young that she had no memory of having seen any other human face than her Father's. Prospero, after having lost his dukedom has become a magician and the ruler of the desert island. By his magic he has overpowered Caliban, the son of Witch Sycorax, the former ruler of the island. Now, twelve years after this arrival here, the witched Antonio with Alonso, King of Naples have been driven by the tempest to this island. Prospero, by his magic power has caused the storm. Their inmate have been widely scattered. Ferdinand, the son of Alonso has been separated from others and has wandered about the island and has met Miranda. Both have fallen in love with each other. It is a love at first sight. Prospero has come to know of it and has liked the development. But he would try to make a trial of Ferdinand's sincerity and therefore, sometimes has assigned the difficult task of carrying logs to him. Miranda has taken pity on Ferdinand and is pleading for mercy for him. Ferdinand, on the other hand, was ready to abandon country, crown and fortune. His behaviour under trials and vexations gains Prospero's approval and when the magician rewards him with the gift of his daughter, he speaks of her as 'My gift and thine own recompense worthily purchased. In the final act of the drama we see that Alonso, who conspired against Prospero, now repentant, is forgiven. Ferdinand and Miranda receive the blessing of Alonso. And all is well again with Prospero. In the story of 'The Tempest' we may have many types of allegorical meanings. Firstly, Caliban is the people. Secondly, he is the primitive man abandoned to himself. Thirdly, he, is understanding apart from 'Imagination'. Fourthly, Caliban is the missing link between man brute. Fifthly, Caliban is one of the powers of nature over which the scientific intellect obtain command. Sixthly, Caliban is a colony of Virginia. Seventhly, Caliban is the untutored early drama of Marlowe, But I think, such allegorical interpretation, however ingenious, cannot set much store by. The significance of a work of art like caliban is not to be discovered solely by investigation, of its inward essence. Caliban's dynamical qualities, so to speak, must be considered as well as its statical. It must be viewed in action; The atmosphere it effuses, its influence upon the minds of man must be noted. And it is certainly remarkable that this, the last as almost the last of Shakespeare Plays, more than any other, has possessed this quality, of soliciting men to attempts the explanation of it, as of an enigma, and the sometime of baffling this enquiry.

Ariel, as the name signifies, is the spirit of the air, buoyant and ethereal. But he is not this alone, for he is equally at home in sea and fire. He is able to go where he wishes, "...be it to fly, to swim, to dive into the fire, to ride on the curled clouds and can become visible or invisible at will.

My view is that Shakespeare has made Ariel an elemental being of the higher order. He is the 'Higher nature' of man Shakespeare made Caliban an elemental being of the lower order, on the other hand. Ariel's ideas are the ideas associated with the atmosphere-liberty and omnipresence in Act I. Scene II of 'The Tempest' Ariel tried to remind Prospero what he had promised-a promise which has not yet kept. He said to his master-

I have done thee worthy service ;

Told thee no lies, made thee no mistakings, served without or grudge a grumbling : Thou didst promise

To bate me a full year.

Prospero asked. 'what is that you have any claim to demand ?

Ariel replie, 'My Liberty.

Prospero answered. 'after two days I will discharge thee." Ariel is not malicious, cowardly, false and base in his inclination. He is not the vulgur knave.. He only wanted liberty like the civilized man of the world. He had certain feelings of love and gratitude which denote his moral excellence. **ariel, an airy spirit.** The imaginative genious of poverty delivered in England from long slavery to Syncorax. Now let bus explain the allegorical interpretation od Prospero-Miranda.

Prospero may as well be described as the man of genius, the great artist, lacking at first is practical gifts which lead to material success, and set adrift on the perilous sea of life, in which he finds his enchanted island, where he may achieve his works of wonder. He leaves all with him art in its infancy-the marvellous child Miranda. Prospera has devoted years and years to the pursuit of the black magic. His study of magic has a direct bearing upon the events of his life and it was the cause of his misfortune. But his secrecy indeed is the sectrecy of knowledge, his magic is the magic of virtue. For what so marvellous as the inward, vitalmecromancy of good which transmites the wrong that are done him it into motives of beneficience, and is so far from being hurt by the power that it turns their assaults into new sources of strange against them. Prospero, may be said, to be the symbol of the 'higher level' of morality from where he has surveyed the whole of human life..

Miranda is like Lucy Gray of Wordsworth who is the ideal child of nature. She is a Phantom of delight. In her elemental simlicity she is also to be compared with the sinless Eve of Paradise. She is the symbol of wonderland. She is beautiful, modest, tender delicately refined and perfectly unsophisticated. She cannot be compared with any other woman or female character of Shakespeare-so loveliest and sweetest creation she is ! She herself appears a palpable raeality. She, being a woman breathing, walking in the earth and acknowledged the affection of a young man through there is harmonious contrast between Miranda and Ferdinand, Miranda brought up in utter solitude. Ferdinand bred in court, himself the centre of a sphere of the most artificial civilization. Ferdinand made acquaintance with a species of modesty to which assuredly none of those ladies of the court of naples whom he had eyed with best regard had even introduced him.

In connection with Miranda, let us add a few lines more on Ferdinand. Ferdinand is a model youtyh combining all the gifts of nature with virtue. He is brave, honourable and pure in thought. but Shakespeare has slightly sketched the character of Ferdinand.

Again, Ferdinand with his gallantry and beauty, the young Fletcher, in conjuction with whom Shakespeare worked upon the 'Two Noble Kinsmen' and 'Henry VIII'. Fletcher is conceived as a follower of the Shakespeare style and method in dramatic art. He had eyed full many a lady with best regard, for several virtues had liked several women but never any with whole-hearted devotion except Miranda. and to Ferdinand the old hearted devotion except Miranda. And to Ferdinand the old enchanter Prospero will entrust his daughter a third of his own life. But Shakespeare had perceived the weak point of Fletcher's genius-it's want of hardness of fibre, of patient endurance, and of a sense of the solemnity and sincerity and sanctity of the service of art, and there therefore he finely hints to his friend that his winning of Miranda must not be too light and easy . It be Ferdinand's task to remove some thousand of logs and pile them according to the strict injuction of Prespero. Don't despise drudgery and dry-as dust work, young poets' Shakespeare would seem to say, who had himself so carefully coloured over hios English and Roman histories, for Miranda sake such drudgery may well seem Light. Therefore, also, Prespero surrounds the marriage to Ferdinand to his daughter with a religious awe. Ferdinand must honour her as sacred and win her by hand toil.

Henceforth Prespero is but a man, no longer a great enchanter, the returns to the dukedom He had last, in Stratford upon Avon, and will pay no tribute hence to any Alonro on Lucy of them all.

In conclusions I may attempt to trace the source of the plot of 'The tempest'.In writing his play it was customary for Shakespeare to take the outline of some old story, romance, history, early chronicle and fashion it into a dance and in the most cases the original source of 'The Tempest is concerned much stress is laid on the likeness between the plot of Prespero-Miranda-Ferdinand and that of an old German play, 'Die Schone Sidea written by Jacob Ayrer, a Nurnberg notary. In this play there is no desert island and there is no storm. But there is prince who practises magic and whio is attended by a familiar spirit. He, too, has a lovely daughter, and she falls in love with the son of her father's greatest enemy. This young man becomes the magician prisoner, his sword being rendered powerless by magic and he is made the brearer of logs for his mistress, the story ends with reconciliation and the happiness of the lovers.

It is likely that Shakespear had heard of Jacob Ayrer's 'Die Schone Sidea and so there are resemblances between these two plays.

"The knowledge which purifies the mind and heart alone is true knowledge.

- Sri Ramkrishna

"Education is the manifestation of the perfection already in Man."

- Swami Vivekananda

NGOs AND ECONOMIC DEVELOPMENT THE CONNECTING LINK

Ananta Pegu
Lecturer in Economics

Non government Organisations (NGOs), the vehicles of socio-economic developments, have been playing a pivotal role in the present secnerio of the world. Each of the NGOs has some definite aims and objectives for attainment of socio-economic development. NGO is an organisation of private individuals who believe in certain basic principles and structure their activities to bring about development to communities that they are serving. For the very purpose of constitution of NGO, a NGO has to get itself registered under the societies Registration Act. of 1860.

The growth of NGOs can be attributed to the overburdened affairs of government, inefficiency of bureaucracy. The role of NGOs in the socio-economic development, in fact, has been recognized by the UNO and different International Organisation. They supplement government efforts and thereby help government in attaining welfare activities. NGOs are considered as a major collective factor in development activities. NGOs are more successful in implementing welfare and development programmes because they have greater touch with the grassroot bodies and personal contacts and they understand the actual socio-economic conditions and needs of the local people. NGOs are commanding growing attention as possible alternative to government in addressing the needs of the vast population at the grass-root level which are otherwise unreached by the government development agencies particularly in the developing country like India.

Over the years, there have been many significant changes in the idea of NGO activities. Their traditional roles in welfare and service programmes are being strongly supplemented with many development activities. NGOs are performing various activities. David Korten (1987), has classified NGO activities under four categories, i.e., –

i) Relief and welfare
ii) Community Development
iii) Sustainable Development and
iv) People's Movements.

The size of NGO can be classified into four levels –

i) Local level NGOs which look after the socio-economic development of its locality.
ii) Regional level NGOs are those organizations having operational programmes in at least 7 districts or two zones in at least one of the Development Regions.
iii) National level NGOs are defined as those organisations having operational units envisaging at least 7 zones and 21 districts in three development regions.
iv) International level NGOs which consider internationally recognised affairs.

In a vast country like India with millions of people it is not possible for government to redress the affairs of socio-economic development of the entire nation. Due to the very reason its rural people are lagging behind to a considerable extent. It is increasingly recognised that NGOs play an important part in the

preparation, design and application of developmental strategies. Even though the influence and importance of NGOs vary according to the national context in which they operate, their growing presence and increase in number over recent years are undeniable, as is their active role in the search for developmental strategies.

The emerging significance of NGOs as an alternative approach to grassroot development in the third world countries, NGOs are perceived as vehicle for providing democratization and economic growth in the third world countries where markets are inaccessible to the poor or where states lack capacity or resources to meet the basic needs of the majority of the people. The NGOs are catalyst for societal change because they are responsive to the needs and problems of their clients, usually the poor, women and children. NGOs are suitable for sustainable development in grass root communities because they are independent, efficient, less bureaucratic, grassroot oriented and follow participatory approach.

One of the Important activities of NGOs is to generate employment. The large scale contribution of NGOs directly or indirectly help unemployed people to earn livelihood through implementation of various projects from time to time. Each NGO has monetary fund which is gathered from various sources like government grant-in-aid, subsidy, private funding, public donation, foreign funding agencies etc. These funds are utilized in welfare activities at large. So, it can safely be said that in the present time the NGOs can play an effective role for humanity at large. At the same time public awareness and participation can boost its efforts in achieving its goals.

NABIN CHANDRA COLLEGE is a Partner Institute with Indira Gandhi National Open University (IGNOU) New Delhi under Convergence Scheme.

Several Courses are on offer here.

Students of the College and also other from outside can apply for admission to a course of their change in time.

Contact No. : 03845-268153

ROLE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN NORTH EASTERN REGION

Md. Iqbal Uddin
Lecturer of Commerce

Development of a region depends upon the development of entrepreneurship. Development in North Eastern Region can be developed through Entrepreneurial Development Programme (EDP). Present article reflects on the nature, objectives and role of EDP in entrepreneurship development in N.E. Region. This article also reflects on the institution providing EDP in N.E. Region.

In North Eastern Region most of the peoples do not know about entrepreneur and Entrepreneurship and hence such peoples could not become successful entrepreneurs.

An entrepreneur is one who organises and manages his own business and at the same time takes the risks also. An entheprenur is not same as managers. An entheprenur is the owner of the enterprise and so he takes the risks of the enterprise while a manager is the servant in the enterprise owned by the entheprenur and so he does not bear any risk involved in the enterprise. In order to become a successful entrepreneur, the entrepreneur of N.E, Region must have some good characteristics and / or qualities like hard work, desire for high achievement, high optimism, independence, foresight, good organisational abilities innovation, mental ability, human relation ability, technical knowledge, communication ability, decision making ability and conceptual ability.

Entrepreneurship is a process undertaken by an entrepreneur to augment his/her business interest. It is an exercise involving innovation and creativity that will go towards establishing his own business. Just as management is regarded as what managers do, entrepreneurship is regarded as what entrepreneurs do. In simple words we may say that entrepreneurship is the process of giving birth to a new enterprise.

Entrepreneurial Development is an act of encouraging people for entrepreneurial carrier and making them capable of exploiting business opportunities. It is the act of motivating and developing skills of potential entrepreneurs and helping them in developing their own ventures. Entrepreneurial Development programme (EDP) is an effective way to develop entrepreneurs which can help to accelerate the pace of socio-economic development, balance regional growth, and exploitation of locally available resources. EDP is a continuous process of training and motivation to set up enterprise. It is essentially an educational process and regarded as a tool of industrialisation and a solution to unemployment problem.

An EDP equips entrepreneurs and makes them competent to anticipate and deal with a variety of problems that any entrepreneur may have to face. It gives confidence to the entrepreneurs to face uncertainties and take profitable risks. It prepares them to deserve and make good use of various forms of assistance.

EDP plays an important role for the development of entrepreneurship in North Eastern Region.

- ⇨ It identifies and trains potential entrepreneurs.
- ⇨ It imports training in managerial undertaking and skills.

- ⇨ EDP provides post training assistance and monitoring facilities to entrepreneurs.
- ⇨ It develops and strengthens entrepreneurial quality and motivation.
- ⇨ EDPs help the entrepreneurs to select the right profitable projects.
- ⇨ It analyses the environmental issues related to the proposed project.
- ⇨ Besides the above, EDPs encourage first generation entrepreneurs who do not have any business background.

The term Economic Development essentially means a process of upward change whereby the real per capita income of a country increases over a large period of time. It implies progressive changes in the socio-economic structure of a country.

EDP plays a vital role in economic development in N. E. region. But the role of EDP in economic development varies from economy to economy and even region to region depending upon its material resources, industrial climate and the responsiveness in favourable conditions than in the less favourable conditions. That is why underdeveloped countries are far behind in the innovation of entrepreneurs than developed countries. EDP imitates and sustains the process of economic development in N. E. region by different ways like economic growth, balanced regional development, eliminates poverty and unemployment, optimum use of local resources, solves industrial problems, defuse social tension, development of balanced and tribal areas, successful launching of new omits and improving standard of living.

EDP is a tool of industrialisation and path to economic growth of N. E. Region. the entrepreneurs can imitate change in the structures of business and industry. It increases new investment and bring innovations. All theses activities in turn stimulate economic growth. The entrepreneural class speeds up the process of activating the factors of production to ensure higher rate of economic growth.

EDP helps in dispensal of economic activities in different region by providing and other support to local people. EDP increases the number of small scale entrepreneurs who acquire the capability to set-up industrial enterprises in remote rural areas. This reduces the concentration of economic power.

Increasing joblessness or unemployment is the chronic problem of the N. E. Region. EDPS provide economic opportunities for self-employment and entrepreneural careers. These programmes create jobs, incomes and capital in the N.E. Region as well as in the country. These intend to eliminate poverty and solve the problems of unemployment of the N. E. Region.

Abundant resources are available locally. If these resources are used in an optimum way. It will prepare a healthy base for sound economic and industrial development. The optimum use of natural, financial and human resources can be made in the N. E. Region by training and educating the entrepreneurs.

In order to set-up industries and solve the industrial problems EDPS provide various incentives, subsidies and infrastructural facilities to the entrepreneurs of N. E. Region.

EDP defuses social tension in N. E. Region. Every youth feels frustrated if he does not get employment after completing his education. By providing training and other facilities to the young people, EDP diverts their energies to self-employment careers and thus defuse social tension.

EDPs always try to develop the backward and tribal areas. EDPs ensure potential entrepreneurs to set-up their enterprises in backward and tribal areas with the help of the government and institutional support

system. EDP develops motivation, competence skills necessary for successful launching, management and growth of the enterprise. Besides the above, EDP improves the standard of living of the people of N. E. Region.

In order to develop entrpreneurship and EDP the Government of India has established various institutions that provide EDPS in the country. Such institutions are National Institute for Entrepreneurship and small business development (NIESBUD), Enttrepreneurship Development Institute of India (EDII), Small Industries Development Organisation (SIDO), National Institute for Small Industry Development Bank of India (SIDBI) and Technical consultancy organisation (TCos).

In the North Eastern Region Assam is the first state to take initiatives to promote and develop entrepreneurship in a systematic manner. In 1973, the Government of Assam decided to adopt the integrated model of entrepreneurship development evolved by the NISIET for promotion and development of entrepreneurship in the states. This model comprises training, research, counselling and guidance. It includes setting up of Entrepreneurial Motivation Training Centres (EMTCS) which would train and guide entrpreneurs and also provide co-ordinated and integrated services under one roof.

The Assam Government has set-up EMTCS at Kokrajhar, Mangaldoi, Nalbari and Nawgaon.

Accordingly various institutions like EMTC, North Eastern Industrial and Technical consultancy organisation (NEIICO), (MSMES), State Bank of India, District Industries and Commerce Centre (DICC) and North Eastern Council are established for providing EDPs in N. E. Region.

Entrepreneur is the owner of the enterprise while entrepreneurship is the process to set up such enterprise. Entrepreneurial Development Programmes play an important role for development of entrepreneurship and economy of the N. E. region as well as the country. The entrepreneur of the N.E. Region should know the various services and faculties provided to the EDPs and at the same time, they should obtain and implement such facilities and services for the development of Entrepreneurship in the region.

NABIN CHANDRA COLLEGE is a Contact Centre for PG correspondence courses under the Institute of Distance and Open Learning (IDOL) of Gauhati University.

Graduates can apply for admission to courses of their choice in time.

Contact No. : 03845-268153

PANCHAYATI RAJ IN INDIA

MD. Ershad Uddin
B.A. 3rd year

Since Independence our country has faced a paradoxical situation on development front. The balance of development has most of the time Eilted towards the urban few which resulted into lopsided development of the country. In the past, several attempts were made to solve the multi-dimensional rural problems by launching various developments programmes.

The first comprehensive approach to rural development was introduced in India in 1952 through the community development programme. It included schemes for providing substantial increase in the agriculture production, improvement in systems of communication, rural health, hygiene and education. However, the main thrust was on creating physical infrastructure.

Apart from the programmes being introduced on the basis of the mid-term appraisal of the First Five Year Plan, a committee on plan projects popularly known as balanced Rai Mehta Committee, was appointed in 1957 to suggest ways and means for effective decentralisation in our country. Perhaps this may be regarded as the real beginning of democratic decentralisation in India .

In many countries decentralisation is pursued in reaction to the technical failure of comprehensive national development planning of the weak impact of multi-sectoral. macro-economic planning. In some countries, decentralisation is seen as a way of mobilizing support for national development policies by making them, better known at t the local level.

The term 'Democratic Decentralisation has been described in india by various names such as 'functional democracy', Grassroot Democracy' building from below', Panchayat Raj' etc.

However, these nomenclatures do not truly reflect the spirit behind democratic decentralisation. For, in all of them, much more importance has been assigned to democratic element to its development aspect.

After independence, India was staged on the floor of constituent assembly, Panchayat Raj was an important component of Mahatma Gandhi's vision of future India in which economic and political power would be decentralised and each village would be self-reliant economically. It was in deference to the Wishes of Mahatma Gandhi that Article 40 of the constitution of India was adopted stipulating that – "the state shall take step to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self Governments"

Dr. B.R. Ambedkar, however had a different view of the Indian rural society. He argued in the constituent Assembly that the Indian social structure at the village level was hierarchical, oppressive and insensitive to change. In his view, it would be dangerous to give power to the Panchayats as he thought that would mean giving powers to the prevailing rural power structure which would work to the detriment of the Harijans and the rural poor. Two Contrasting views about decentralisation have thus surfaced in the consttuent Assembly : a visionary stand point of decentralisation and a realistic view of decentralisation.

The decentralisation debate has it roots at the conceptual level. The concept of panchayati Raj has been far from clear and as the Ashoka Mehta Committee commented, "Some would treat it just as an adminis-

trative agency; others as on extension of democracy at the grass root level and still others as a character of rural local Government"

In 1957, the Term for the study of community projects and National Extension Service, popularly known as Balavantrai Mehta Committee after the name of its Chairman, published its report recommending a three-tier system of rural local Government, called Panchayati Raj in India'. The Principal trust of the Balvantrai Report was towards decentralisation of democratic institution in an effort to shift decision centres closer to the people to enable their participation, and to put the bureaucracy under local popular control. Rajastan and Andra Pradesh were the first to have adopted the Panchayati Raj form of rural local Government, the year being 1959. They were joined by other states in course of time. Every where Panchyat Raj was introduced with great fanfare, and it easily constitutes the most conspicuous measure of reform in the system of Governance in Independent India.

The present structure of panchayati Raj was designed in the early sixties (60's), and it necessarily takes time for it to grow roots and enter into the minds of the rural people. rural people have their own psyche; they are rather slow in accepting innovations but having accepted, are rather secptical about proposals for their abandonment. It is only recently that the Panchayati Raj glossary has gained their understanding and even acceptance. Words like 'block', 'Panchayat Samity', 'Gram Panchayat', etc have now become house hold expression in rural India.

The Asoka Mehta Committee treats rural development as part of the urban rural continuum and therefore argues for the provisions of urban amenities, such as roads, portable water, medical care, employment and education in the rural areas to weaken or even neutralise the pull for migration to urban centres. This is good in so far as it goes, but on closer analysis, it does not seem to go very far. The present pattern of local Government in India is essentially based on rural urban dichotomy ; the two arms of local government, urban and rural, presently constitute two separate independent entities with little organic inter relationships characterising their activities.

To establish democratic functioning at the grass root level, the Rajiv Gandhi Government introduced the 64th and 65th Constitution Amendment Bills but the effort failed. In general election that was held in 1991 no political party won majority. The Congress emerging as the single largest party in the Lok Sobha. formed the Government. Like the preceding V.P. Singh and Chandra Shekkar ministries, P.V. Narasimha Rao's Congress Government was also a minority one in the beginning. The Narasimha Rao Government took up the issues with the some motive and succeeded in passing 73rd 74th Constitution Amendment Acts in 1992, dealing with Panchayati Raj institution (Rural local Govt.) and municipalities (urban local Govt. respectively.

The 73rd Amendment Act contains the following features :-

i) Every State shall have a three tier Panchayat system ; Gaon Panchayat at the village level, Ancholik Panchayat at the block level and Zilla Parishad at the district level.

ii) The President of a Gaon Panchayat and other members shall be directly elected after every five years. M.L.A. and M.P. of the locality shall be ex-officio members.

iii) No. Panchayat can be susspended for long; fresh elections will have to be held within six months.

iv) The Act provides for the creation of a Finance Commission to review financial provision of the panchayats and to make necessary recommendations.

v) The Act has added the (Art. 243G) 'Eleventh Schedule' comprising 29 specific areas of operations for panchayats.

vi) The Act provides for a state election commission to conduct election for local bodies.

vii) A person shall be disqualified for being a member of a panchayat if he holds any office of profit under the central or state government or if he is of unsound mind.

The Panchayati Raj bodies are empowered to take decision on 29 clearly defined subjects, all concerning their day-to-day lives. They are the implementing agency of the state governments. The functions conferred on panchayati Raj institutions are the following :-

1. Agriculture, including agriculture extension.
2. Land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation.
3. Minor irrigation, water management and watershed development.
4. Animal husbandry, dairy and poultry.
5. Fisheries.
6. Social forestry and farm forestry.
7. Minor forest produce.
8. Small scale industries, including food processing industries.
9. Khadi, village and cottage industries.
10. Rural housing.
11. Drinking Water.
12. Fuel and fodder.
13. Roads, culverts, bridges, ferries, water ways and other means of communication.
14. Rural electrification, including distribution of electricity.
15. Poverty alleviation programme.
16. Non-conventional energy sources.
17. Education including primary and secondary schools.
18. Technical training and vocational education.
19. Adult and non-formal education.
20. Libraries.
21. Cultural activities.
22. Markets and fairs.
23. Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries.
24. Family welfare.
25. Women and child development.
26. Social welfare, including welfare of the handicapped and mentally retarded.
27. Welfare of the weaker sections and particularly the scheduled castes (SC) and the scheduled tribes (ST)

28. Public distribution system.

29. Maintenance of community assets.

The Panchayati Raj Act. passed by parliament in December 1992 easily constitutes a milestone in the history of rural local Government. The Seventy-Third Amendment Act is thus, a bold step towards panchayati Raj in India.

The 73rd and 74th Constitution Amendment Acts have their own significance in the sphere of Panchayati Raj and have earned a distinction for India. But the desired impact of this noble step is till awaited.

Panchayati Raj institutions are often criticised for being dominated by local groups based on castes. A typical Indian village is a stratified one, and the strongest identification tag here is caste.

Some critics consider the absence of such provisions as shortcomings, but these are more than compensated for by the regularity of the election process and the holding of local elections by an autonomous election commission set up in each state. In several states, panchayat elections have not been held for 10 to 20 years.

Local Government in India, both rural or urban, have not been a great success. A part of the fault lies in the system, a part in the immediate social environment but a large part is to be attributed to the controlling state government itself. The state Government has not been holding elections to the local bodies regularly. Secondly, even when elected, these bodies has suffered suppression by the state Government on flimsy grounds. Thirdly, inadequacy of funds available to local bodies has been a chronical problem before all local bodies. With weak financial base they are hardly in a position to initiate measures for the advancement of the local community. Fourthly, the local Government bodies are dominated by powerful local groups based on caste and economic status.

Yet, it would be an act of immaturity to be little the significance of the constitution (Seventy third Ammendment Act. Local government including both Panchayati Raj and urban Government is, today, the third layer of the system of government. So far as the constitution status is concerned, local government, for the first time, is on par with the central and state governments, which itself is most creditable.

Commerce Department of **NABIN CHANDRA COLLEGE** is running UGC-Sponsored Career Oriented Course normly **Marketing Management Entrepreneurship Development and Computer Application in Business.**

Interested TDC students of all streams of the College can meet the Head of courses Department for details.

HISTORY OF CORPORATE GOVERNANCE RELATING TO INDIAN COMMERCIALISATION

Md. Tahir Ahmed
B.Com Part I

"Corporate governance is about promoting corporate fairness, transparency and accountability."

The concept of corporate governance relates to the code of conduct the management of the company observes while increasing its powers. It can be best defined "Corporate governance is about promoting corporate fairness., transparency and accountability." Effective accountability to all stoke holders is the essence of corporate governance. this concept is gaining momentum because of various factors and the hanging business environment. The EEC, IATI and WTO regulations have also continued to the rising awareness.

The new paradigm of corporate governance is to bring about quality. In India the concept of corporate governance started in the wake of economic liberalisation and deregulation of industry and business as well as the demand for a new corporate ethos and stricter compliance with the law of the land. it is important for the economic health of corporations and society. It covers a large number of distinct economic phenomena. The focus of good governance should be the code of best practices like those in the USA and UK.

Till recently all wasn't well with corporate governance practice in India. For instance what Swaraj Paul's take over bid of show Wallace and Gammon India during the pre-reform era, brought out was not only the desire of existing managements to retain control with minority status, but also the readiness of financial intuitions to bow to their practical masters. This seems to be changing now

Corporate misdeeds have been exposed after liberalisation measures were initiated. In the pre-reform days companies relied less on capital markets for running additional resources. Financial institutions were ready to lend at subsidized investment rates. The only major worry for promoters was the convertibility clause which resulted building up substantial equity stakes. However as long as the relationship between financial institutions and the politicians was in place, there was little possibility of the financial institutions flexing main muscle further, things like takeover were more or less unheared of and there was little likelihood of the existing management being booted out for non-performance.

The scenario has dramatically changed in the fast ten years. Companies are increasingly depending on the capital market for rising funds. Investors are in turn demanding performance that includes sound corporate governance practices. Managements have now begun to appreciate that the only real option to retain control into manage the company well and keep share prices high in order to discourage corporate raiders. With new corporate scams coming to light the financial institutions are being called to play an active and effective role in corporate governance.

Corporate governance practices in India should be changed for the better. Promoter should become answerable and responsible share holders. The financial institutions are at last appreciating the interventionist role they need to play ensuring sound corporate governance. Share holders are now becoming conscious and demanding. Regulatory bodies like SEBI should make necessary changes in the legal framework so that transparency is ensured. Thus inspite of all the scams coming to surface, there is still a ray of hope.

@@@

POVERTY SCENARIO IN INDIA

Nahed Vawsar Choudhury
B.A. 3rd Year

Poverty can be defined as a social phenomenon in which a section of the society is unable to meet even the basic necessities of life. When a substantial segment of a society is deprived of the minimum level of living and continues at a bare subsistence level that society is said to be plagued with mass poverty. For instance in India the generally accepted definition of poverty emphasises minimum level of living rather than a reasonable level of living.

Poverty has become a vice to the Indian Economy. It has made the Indian economy handicapped to achieve the Zenith of development. India, first of all, will have to overcome the greatest challenge of poverty problem. So, far the government of India has adopted numerous poverty eradication programmes, but they have failed to achieve success. The main factors responsible for the poverty problem are rapid growth of population, unequal distribution, unemployment and under employment etc. It would be of interest to know the total numbers of poor people and poverty percentage in total population. The data reveal that between 1973-74 & 1987-88, the poverty percentage declined from 54.9 percent in 1973-74 to 44.5 percent in 1983. The fastest decline in poverty is observed during 1993-94 to 1999-00, that is at the rate of 3.4% per annum and the absolute number of poor declined to 260 million in 1999-00. But during the next five years, though the rate of growth of GDP was of the order of 6.5% per annum, number of poor people showed a very small decline from 260 million to 250 million, indicating an annual decline by 0.8% during 199-00 and 2004.

In the present era, the Government of India has adopted vigorous programmes particularly for the eradication of poverty. Both the Central Government and the State Government have been spending increasing amount on the various items of social welfare particularly benefiting the poor. Poverty reduction requires a pro-poor strategy of growth which implies creation of more employment opportunities in those sectors which help the poor to raise their level of income.

Now that its true nature has been recognised, given the will and determination and time, some success may be possible.

Education is not amount of information that is put into your brains and runs riots there, undigested all your life, we must have life-building , man -making, charcter making assimilation of ideas."

- Swami Vivekananda

BOND OF FRIENDSHIP

Banti Roy
B.A. 2nd Year

I miss you, my friend,
Do you miss me as I do ?
We all know that
We are now miles away from each other
Going on our own ways,
Wherever our destiny is leading us.

Do you remember ?
We were six in a group;
Our bond of friendship was so strong.
We shared every little thing;
Our joys, sorrows
Knowledge and thoughts.

Do you remember ?
Each and every moment we spent
Was like a dream of our happy days.
Will it come back to me again ?
Now the question arises within me whether,

I shall be able to
Meet you all and keep my promise.
Shall I be able to
Unite with you all ?

Now I pray to the Almighty
With silent tears in my eyes.
Begging Him that,
May this separation not separate our souls.

And hope we will meet in heaven,
Where friendship never ends.
And these are my silent wishes for my friends.
For today, tomorrow and everyday !

THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL (IQAC) OF NABINCHANDRA COLLEGE

Rajat Bhattacharya
Coordinator, IQAC
&
Head, Deptt. Of English
Nabinchandra College

1. What is the IQAC?

The IQAC or the Internal Quality Assurance Cell is a separate department in the college. It is made up of the Principal, some teachers, some non-teaching staff members and some members of the Governing Body of the college. It tries with the college management to bring or assure quality in all the affairs of the college. These affairs mean activities of the students, the teachers, the library staff, the principal and his office in fact all who make the college run everyday. All colleges and universities in our country that are visited and recognized by the NAAC have an IQAC like this. The NAAC or National Assessment and Accreditation Council in Bangalore is an organization of the central government that helps those educational institutions in assuring quality in work. Our college set up an IQAC in 2005 after it was visited and recognized by the NAAC with Grade B. Since that time the IQAC in our college has been an important organ of the college.

2. Why is the IQAC?

The IQAC has been set up under instruction from the NAAC. With this the NAAC wants to tell us strongly that quality in higher education should be always maintained. This is because without quality nothing can really be fruitful in the practical world. For example, if a graduate does not know how to use his knowledge of things (gained in the classroom) for benefit in the real world he cannot succeed in getting a good job. His certificates alone cannot guarantee a good job. In this way the IQAC for us is a constant reminder of the need to assure quality in our academic work.

3. Where is the Centre of Quality?

Without doubt the centre of quality is in the classroom. An educational institution has three broad areas of activities: classrooms, the library and the principal's office. Of the three, the most important is the classrooms. The other two only revolve round it under its gravitational pull. There are three reasons for saying so. First, an educational institution exists for teaching its students. Second, students acquire knowledge of subjects in classroom. Third, students interact with teachers in classroom and develop their thinking, mind, communicative abilities and personality .These attainments of students slowly result in manifestation of their skills. One may say classrooms today do not attract students as before and private tuition in many places is taking the lead. Even then, for mental, intellectual and personality development classrooms have no substitute. Classrooms certainly have lost some of their glory today, but this has to be given back by our united efforts. Here it seems the teachers are to lead because they are the torch bearers. It is perhaps their motivation that has to revive, first of all. Otherwise, quality may remain a distant dream.

THE LARGE HADRON COLLIDER

Nilabjo Kanti Paul
H.S. 1st Year (Science)

The beauty of human mind is its capacity to think and explore everything around him so minutely that it always leads to many discoveries and invention in the world of science.

The large Hadron Collider or the L.H.C. is one such international research project which tries to throw light on the unknown facts about the beginning of our universe and its principles of working.

About the LHC :-

LHC is the largest scientific experiment ever conducted, based at CERN in Geneva, Switzerland, where scientists, engineers and support staff from 111 nations work together. The LHC is the latest and most powerful particle accelerator over the last 70 years that have allowed us to penetrate deeper and deeper into the heart of matter and further and further back in time.

What is the LHC ? :-

LHC, Strictly refers to the collider, a machine that deserves to be called 'large' because it not only weighs more than 38,000 tones, but also runs for 27 Km. in a circular tunnel 100 metres beneath the Swiss-French border at Geneva.

What will the LHC do? :-

Though there have been many rumours about the LHC being probably able to destroy the plannet - earth due to its high energy release, the scientists have proven all these to be wrong and firmly believe that this project would allow them to probe, deeper into the heart of matter and reveal the true facts about the origin of universe. One of the most interesting theories that LHC will test was put forward by the great physicist of UK Professor Petter Higgs and others that though different fundamental particles have different masses, the particles that form light (Photons) have no mass at all. The LHC will allow us to test this amazing but interesting theory known as Petter' s theory.

How does the LHC work ? :-

The LHC accelerates two beams of atomic particles in opposite direction around the 27 K.M. collider. When the beams reach the speed equal to almost the speed of light the collider allows them to collide at 4 points on their circular journey:

This will lead to the production of thousands of new particles which CMS detectors placed around the collision points will detect and allow the scientists to identify them according to their behaviour.

As the energy produced in the collision increases researchers are able to peer deep into the fundamental structure of the universe and further back in its history. In this extreme condition, unknown particles may appear.

@@@

NABIN CHANDRA COLLEGE LIBRARY
BADARPUR

নবীনচন্দ্র কলেজের এন.সি.সি. এবং এন.এস.এস.-এর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রণপ্রথা বিরোধী পথ-যাত্রায় ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ (১৪ আগস্ট ২০০৯)।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রদর্শিত নৃত্যের একটি দৃশ্য (২০০৯)।